বিজয়ের সোপান

শাইখ আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ খালিদ আল-আদাম

রহিমাহুল্লাহ



AL HIKMAH MEDIA

বিজয়ের সোপান

মূল

শাইখ আবু উবাইদা আলমাকদিসি
[আব্দুল্লাহ খালিদ আল-আদাম]
রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



AL HIKMAH MEDIA

উৎসর্গ...

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রাহিমাহুল্লাহর প্রতি, যিনি তাওহীদবাদীদের অনুপ্রেরণা, যিনি সত্য-ন্যায়ের পথের দিশারী, যিনি মোক্ষম আঘাতে ছিন্ন করেছেন মিথ্যা প্রভুত্বের দাবীদার তাগুত গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের জাল।

যুগ সংস্কারক ইমাম শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর প্রতি, যিনি এই উম্মতের মাঝে জিহাদ ও শাহাদাতের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন; যখন অধিকাংশই ধরে নিয়েছিল এই সুন্নাহ উম্মতের মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বীরকুল শিরোমণি, শাহাদাতের পাখি, শহীদদের আমীর, ক্রুসেডার এবং তাদের দোসর রাফেজী ও মুরতাদ গোষ্ঠীর আতঙ্ক, আল্লাহর রঙে গর্বিত মুজাহিদ শাইখ আবু মুস'আব যারক্বাবী রাহিমাহুল্লাহর প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিজ অনুগ্রহে ভরপুর প্রতিদান দান করুন!

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته،وبين لهم طريق النجاة في كتابه،الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه،والصلاة والسلام على رسوله النبي الأكرم،والقائد الملهم،والقدوة المعلم،محمد صلى الله عليه وسلم،وعلى اٰله الأطهار الأبرار،وصحابته الغرّ الميامين الكرام،وعلى من سار على هديهم واقتفى سنة آثارهم وإلى يوم الدين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নিজ কুদরতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যিনি জগৎবাসীকে নিজ কিতাবে মুক্তির পথ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এই কিতাব মিথ্যার সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর অতি সম্মানিত নবী ও রাসূল, ইলহামপ্রাপ্ত সরদার, ঐশী জ্ঞানে দেদীপ্যমান নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূত-পবিত্র, পূণ্যবান পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর সৌভাগ্যবান, সম্মানিত সাহাবীবর্গের ওপর এবং প্রতিদান দিবস অবধি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারী ও তাঁদের আদর্শের অনুগামী প্রতিটি সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর!

হামদ ও সালাতের পর...

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আর তা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অবক্ষয় ও অধঃপতন, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত অনুশাসন অনুপস্থিত থাকার পরিণতি ও কুফল। স্বেচ্ছাচারী মুরতাদ গোষ্ঠী আজ মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। মু'মিন বান্দাদের এবং রব্বে কারীমের সংবিধানের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। আর চলমান এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে — ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—বিভিন্ন শ্রেণী নানারকম মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। মানবরচিত এই তন্ত্র মন্ত্রগুলো আদতে আল্লাহর মনোনীত সুস্পষ্ট সেই মানহাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক,

যা মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তবু তারা নিজেদের মনকে বুঝ দিয়েছে, এটাই সঠিক পন্থা, এটাই সরল ও সত্যপথ; যে পথে চললে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ সম্ভবপর হবে।

- এদের মাঝে এক শ্রেণী ইসলামী সমাজ নির্মাণ এবং আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শিরকী গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। শুধু এটা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং একধাপ এগিয়ে এ পথকেই একমাত্র পথ ও সর্বোত্তম পন্থা বলে দাবি করেছে তারা। দাবি করেছে এ পথের আলোকেই সবকিছু পরিচালিত করতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।
- অপর এক শ্রেণী আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে আর সবকিছুই পরিত্যাগ করেছে। তারা সিদ্দিকে আকবর, উমার এবং উসমানের ন্যায় আন্তরিক স্বচ্ছতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনকে ইসলামী সমাজ নির্মাণের মিশন এমনকি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ শুরু করার আগে অবশ্য পূরণীয় শর্ত বলে সাব্যস্ত করেছে।
- তৃতীয় আরেক শ্রেণী রয়েছে, যারা হিকমাহ, সদুপদেশ ও শান্তিপূর্ণ উত্তম নাসীহা'র মাধ্যমে মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ নিয়েই তুষ্ট থাকে। তারা মনে করে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সংশোধিত করতে হবে। তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমাজে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে।
- চতুর্থ শ্রেণীটি পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে সাহায্য, বিজয় ও সুযোগের অপেক্ষা করে বসে আছে। তাদের প্রতীক্ষা ক্ষমতার সোনার হরিণ বাগে আনার এবং রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার। একবার রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে ফেললেই আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে- এমনটাই তাদের চিন্তাভাবনা।
- পঞ্চম শ্রেণীর মূল কথা হচ্ছে, আমাদেরকে কল্যাণ সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মানুবর্তী ও যুগোপযোগী করতে হবে। উঁচু উঁচু পদে নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দূর করার এই প্রক্রিয়াটিই পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম

> পদ্ধতি। মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের পথে নিয়ে যাওয়া এবং তার ভিত্তিতে একটি ইসলামী সমাজ নির্মাণের এটিই সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা।

এমনই নানা চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণা ও তত্ত্বের এক উত্তাল স্রোতে আজ আমরা দিকহারা হয়ে পড়েছি। অথচ বাস্তবে এসবই অপরিপক্ক মানব মস্তিষ্কের নিস্ফল সৃষ্টি। এ পদ্ধতিগুলোর একটিও ইসলামী সমাজ নির্মাণের সঠিক পদ্ধতি নয়। অথচ মুসলিম উম্মাহ এইসব অবাস্তব, অসম্পূর্ণ পদ্ধতিগুলোকে ইসলামী সমাজ নির্মাণের পদ্ধতি ভেবে অনুসরণ করছে। নিজেদের জান, মাল, সময় এগুলোর পিছনে বিনিয়োগ করছে।

প্রবৃত্তি, জাগতিক ফায়দা এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করে প্রত্যেকেই নিজের কর্মপন্থা ও পদ্ধতিকে সর্বাধিক উপযোগী ও মুসলিম সমাজ বিনির্মাণের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম বলে দাবি করে বসেছি। আমরা প্রত্যেকেই মনে করছি, সত্যের পথসঙ্গী তো শুধুই আমি! আর এই ভুলের কারণে আমাদের দৈন্যদশা আরো বৃদ্ধি লাভ করেছে।

অবাস্তব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের জান মাল সবকিছু উৎসর্গ করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করছি না। কিন্তু একটি বারের জন্যও জ্ঞান আহরণ, পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস অধ্যয়ন, সমাজ নির্মাণে আল্লাহর সুন্নাহ ও অমোঘ নীতি সম্পর্কে অবগত হবার প্রয়োজন আমরা বোধ করছি না। নবী-রাসূলদের কর্মপদ্ধতি, তাঁদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের অনুসৃত পথ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। চিন্তা করার দরকার মনে করছি না- তাঁরা কীভাবে শরীয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন? কীভাবে উম্মাহর ভিত্তি স্থাপন করেছেন?

সরল ও সঠিক পন্থার বিরোধী এতসব বক্রপথ ও বিকৃতপন্থার স্রোতে আজ অধিকাংশ মানুষের নৌকা ভেসে রয়েছে। এরা ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি ও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের অনুসৃত পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে গবেষণা ও বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির চোরাগলিতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভ্রান্ত কর্মপন্থাসমূহর অসারতা

আলোচনার চেষ্টা করেছি। পাঠক! অচিরেই ইনশা আল্লাহ, আপনাদের সামনে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন তাঁর দ্বীনের খেদমত করার। যিনি নিজ অনুগ্রহ ও অপার মহিমায় আমাদেরকে সহজতা দান করেছেন। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লালনকারী তাওহীদবাদী ভাইদের জন্য কর্মপন্থা ও আকীদাহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেছি। আমরা বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, আমাদের এ কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এবং আমাদের আলোচিত এ পথই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতে রাশেদা পুনরুদ্ধারের সঠিক ও সরল পথ।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿يوسف: ١١١﴾

"তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।"।[১]

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা জরুরী। আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা এবং এই দ্বীনকে সাহায্য করার যে রূপরেখা আমরা নিরূপণ করেছি, তা নিম্নে বর্ণিত হাদীস হতে সংগৃহীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। জামাআত বদ্ধ হওয়া, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত এবং জিহাদের"।[২]

---

[১] সূরা ইউসুফ;১২: ১১১

[২] মুসনাদে আহমাদ: খণ্ড- ২৯, হাদীস নং- ১৭৮০০

যুগের ইমামুল জিহাদ, মৃতপ্রায় ফরজের পুনরুজ্জীবিতকারী শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক বক্তব্যে আমাদের এই চিন্তাধারার কিছু কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এখানে পাঠকদের আরো একটি বিষয় স্মরণ রাখা অপরিহার্য। এই গ্রন্থটির রচয়িতা এমন এক ব্যক্তি, যিনি জর্ডানে ইখওয়ানুল মুসলিমিন পরিবারের সদস্য। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে জর্ডানের 'যারকাব' শহর; যা মূলত ইখওয়ানের প্রধান কার্যালয়, সেখানকার একজন সদস্য। তিনি ওই জামাতের সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন। তাদেরকে সমর্থন করেছেন। তাদের চিন্তা-চেতনা প্রচারে কাজ করেছেন।

কেবল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর শ্রম ব্যয় হয়েছে এমন নয়। বরং দাওয়াত ও তাবলীগের পেছনেও তাঁর সময় ব্যয় হয়েছে। আরবে তাবলীগ জামাআতের প্রাণকেন্দ্র 'হাজাজ' (ইরাকের একটি শহর) শহরে তিনি একাধিকবার সফর করেছেন। এই শহরে তাদের মারকাজ মসজিদ অবস্থিত এবং প্রধান মুরুব্বী শাইখ এওয়াজ (হাফিজাহুল্লাহ) যেখানেই অবস্থান করেন। এই সবই তিনি করেছেন সত্যকে চেনার আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং প্রতিদান লাভের আকুতি নিয়ে।

উপরোক্ত জামাত দুটোর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতার বিষয় উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে কল্যাণবিরোধি ব্যক্তির জানা থাকে যে, গ্রন্থপ্রণেতা এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্বোক্ত দুই দুইটি জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটিয়েছেন। তাদের শিক্ষা ও নীতি-নৈতিকতা, তাদের কর্ম ব্যবস্থা ও রুটিন মাফিক কর্মসূচী তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগতি লাভ করেছেন। এই সবকিছুর পরে তিনি হিজরত এবং জিহাদের জন্য বের হলেন। এবং তখন তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর দ্বীনের বিজয় কোনো অবস্থাতেই ঐ সব পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব হবে না যেগুলোর অনুসরণকারীরা আল্লাহর মানহাজ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে এনেছে। সত্য বিবর্জিত এ সমস্ত পন্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এসব পন্থা হাবিবে মোস্তফা আমাদের রাহবার মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত পন্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এসব পথ ও পদ্ধতি সমাজ নির্মাণ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরায়ত নিয়মের বিরোধী।

নিশ্চয়ই জাতি গঠনের পথ অতিদীর্ঘ ও বন্ধুর। এ পথের যাত্রা কষ্টসাধ্য, ক্লান্তিকর। সর্বপ্রকার পাথেয় সংগ্রহ না হলে এ পথচলা অসম্ভব।

হে রাসূলের অনুসারীরা! আপনাদের কী এ কথা বোঝার সময় এখনো হয়নি যে, রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠনের জন্য সংঘর্ষ মোকাবেলা করা অপরিহার্য? এক্ষেত্রে চড়া মূল্য না দিয়ে কোনো উপায় নেই? সেই উচ্চ মূল্যের কথা কবি এভাবে তুলে ধরেছেন—

“জাতীয় জীবনের মর্ম যদি কেউ উদ্ধার করতে চায়, (সে জেনে রাখুক) শহীদের রক্ত সে মর্ম উদ্ধার করে থাকে।

যদি রক্ত প্রবাহিত না হতো তবে তুমি এমন কোনো জাতি দেখতে না, যারা নিজেদের কাঙ্খিত গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে।”

হে নবীদের উত্তরসূরীরা! যদি আপনারা আন্তরিকভাবেই খিলাফতে রাশেদার ছায়ায় আশ্রয় নিতে চান এবং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে জেনে রাখুন, এটাই প্রকৃত পথ।

আল্লাহ তা’আলার নিকট অশ্রুসজল মিনতি এই যে, তিনি যেন আমাদের এই কাজকে কবুল করেন! ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা লালনকারী একত্ববাদীদের জন্য এতে কল্যাণ ও পরিশুদ্ধির উপাদান রাখেন! আর এর বিরোধিতাকারীরা, যারা সুস্পষ্ট সত্য-সঠিক মানহাজ বিরোধী এবং বিকৃত মানহাজের অনুসারী; তাদের জন্য যেন এতে হেদায়েত ও সুপথপ্রাপ্তির খোরাক রাখেন।

প্রিয় পাঠক! আপনাকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি একটি মানবিক প্রয়াস, যা ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এখানে যা কিছু সঠিক ও যথার্থ রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এখানে যা কিছু ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে; আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এর জন্য দায়ী নন। আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

লেখক—

আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদ আল-আদাম

(আল্লাহই তাঁর জন্যে যথেষ্ট)

রিবাতের কোনো এক সীমান্ত থেকে...

১৮ রমজান, ১৪২৭ হিজরী, ১০ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।

মুসলিম উম্মাহ্'র বর্তমান অবস্থা এবং তাদের শাসকদের বাস্তব প্রকৃতি

মুসলিম উম্মাহ'র বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কেবল অশ্রু ঝরাতে হয়। অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হয়। মানব কল্যাণের জন্য প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহকে যখন কেউ স্বচক্ষে নীচ জাতির লুণ্ঠনের শিকার হতে দেখে—যখন দেখে তাদের ভূমিগুলো নিকৃষ্ট শয়তান পূজারীদের বিচরণক্ষেত্র—যখন কেউ প্রত্যক্ষ করে, মুসলিম দেশগুলো উদ্ধত খোদাদ্রোহী জাতির অভয়ারণ্য হয়ে আছে, তখন সে আনমনে স্বগতোক্তি করে, হায়! এই কি সেই জাতি নয়, যারা এক সময় ছিল বাতিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর যোদ্ধা? এরাই না একসময় দুনিয়া শাসন করেছে? এরাই না একসময় গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে?

নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মুসলিমদের এই দুর্যোগ-দুর্দশা, অপমান ও অবমাননা, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা, নব্য ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের শিকার হওয়া, এককথায় ইসলাম ও মুসলিমদের সামগ্রিক ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও নাস্তিক্যবাদের গ্রাসে পরিণত হওয়া—এ সবই হয়েছে বাস্তব জীবন থেকে আল্লাহর মনোনীত ও শাশ্বত শরীয়তের অনুপস্থিতির কারণে। এবং মিথ্যা 'রব' দাবিদার মানুষরূপী শয়তানদের হাতে রচিত জাহিলি সংবিধান ও অপরাপর ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার দ্বারা শাশ্বত এই শরীয়ত পরিবর্তিত হবার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ। সংবিধান তথা জীবন বিধান রচনার একমাত্র অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ'র। অথচ মানুষরূপী এ সমস্ত শয়তানগুলো নিজেরা সংবিধান রচনার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

মুসলিমদের ওপর চেপে বসা এ সমস্ত রাজা-বাদশাহ এবং শাসকবর্গ এই জাহেলি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। যার দরুন তারা আল্লাহর একক অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা নিজেদেরকে মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকারী মনে করছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো, খোদা দাবিদার এ সমস্ত তাগুত গোষ্ঠীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা এবং শরীয়তের

প্রমাণাদি তাওহীদবাদী ভাইদের জন্য তুলে ধরা। যেন এর মাধ্যমে মুক্তিকামী সত্যসন্ধানী মু'মিনরা শাসনের আসন দখল করে রাখা এ সমস্ত রক্তপিপাসুর দল এবং তাদের পদলেহনকারীদের চিনতে পারে। এই ভ্রান্ত, পরাজিত ও নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা দানকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। মু'মিনদের কাছে যাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে কাজ করা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ এই সমস্ত তাগুতি ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় কখনোই নিষ্কণ্টক হবে না। এ ব্যবস্থা কেবল সে সমস্ত প্রয়াসকেই স্বীকৃতি দেয়, যা তার ছত্রছায়ায় ও অধীনে হয়ে থাকে। এই স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবেও হয়ে থাকে।

হে আমার আকীদার ভাই! সত্য সন্ধানী হে প্রিয় মুসলিম ভাই! আমি আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সামনে কিছু আয়াতে কারিমা ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করছি। এতে আপনার নিকট নব্য ইয়াসিক পূজারী[৩] এ সমস্ত তাগুত গোষ্ঠীর কুফরের বিষয়টা প্রতিভাত হয়ে যাবে, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুর্বল উম্মতের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এবং ইনশা আল্লাহ এ বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে আমরা এ সমস্ত

---

[৩] ইয়াসিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় টীকা আকারে-

ইয়াসিক ছিল তাতারি সম্প্রদায়ের সংবিধান। এটি তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের রচিত আইন যার নাম আল-ইয়াসা (الياسا) বা আল-ইয়াসিক (الياسق)। তারা সামগ্রিকভাবে এই বিধান প্রয়োগ করত এবং এটি ছিল তাদের 'পবিত্র সংবিধান'। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ কালে তারা এটি সাথে বহন করে নিয়ে যেত।

৬১৬ হিজরীর দিকে তারা মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ চালায়। ৬৮০ হিজরিতে তাতারীরা মুসলিম হয়ে যায়। মুসলিম হওয়ার পরও তারা তাদের পূর্বের সংবিধান ইয়াসিক অনুযায়ীই চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান আগের মতো ইয়াসিকই রয়ে যায়। তাতাররা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে চেঙ্গিস খানের অনুসরণ করে। সে আল-ইয়াসিক আইন তৈরি করেছিল যা ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলামী বিধান হতে নির্বাচন করে তৈরি করা। আবার কিছু বিধান ছিল তার নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত। একে তারা ইসলামী বিধানের মোকাবেলায় প্রাধান্য দিত ও যথেষ্ট উন্নত এবং যুগোপযোগী বলে মনে করত।

আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত বাদ দিয়ে কুফরী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কারণে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তাদের কাফের ফতোয়া দেন। যারা ইসলামী আদালতে বিচারের জন্য না গিয়ে তাতারীদের আদালতে বিচারের জন্য যাবে এবং যারা তাতারীদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এবং প্রখ্যাত মুফাসসির, তাফসীরে ইবনে কাসীরের প্রণেতা হাফেয ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এ একই ধরনের রায় দেন। তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ৬২৪ হিজরীর ইতিহাসের আলোচনায় চেঙ্গিস খান ও ইয়াসিকের কথা এসেছে।

শয়তানের দোসর, তাদের পদলেহী উলামায়ে সূ' ও জ্ঞানপাপীদের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে পারব। আর আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।

অতীত এবং বর্তমানের অসংখ্য তাকওয়াবান আলেম, দয়াময় আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তনকারী শাসকগোষ্ঠীর কুফরকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আলেমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাগুতের প্রতি কুফরী তথা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তাবলীর একটি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ ভিন্ন যত কিছুর ইবাদাত, যত কিছুর পূজা-অর্চনা করা হয়, সম্পূর্ণভাবে সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴿البقرة: ٢٥٦﴾

'যে তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল, প্রকৃতপক্ষে সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল'।[৪]

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম, তাগুতের প্রতি কুফরী, আল্লাহর প্রতি ঈমানের চেয়ে অগ্রগণ্য। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হবে না যতক্ষণ সে অন্যান্য উপাস্যদের সাথে এবং মানুষের বানানো আল্লাহর অন্যান্য শরিকদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। এবং তাদেরকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করবে না।

তাগুত এর আভিধানিক অর্থ:

ভাষাশাস্ত্রবিদ উলামায়ে কেরাম 'তাগুত' শব্দের সংজ্ঞা যেভাবে দিয়েছেন-

---

[৪] সূরা আল-বাকারাহ; ০২: ২৫৬

(ইমাম ওয়াহেদীর বর্ণনা মতে)— সকল ভাষাবিদ বলেছেন: الطَّاغُوتِ এমন প্রত্যেক জিনিস, আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয়। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ...সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴿النساء: ٦٠﴾

"তারা তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা কামনা করে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে"। [৫]

এখানে الطَّاغُوتِ শব্দটি একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿البقرة: ٢٥٧﴾

"আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়"। [৬]

এ আয়াতে الطَّاغُوتِ শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا ﴿الزمر: ١٧﴾

"যারা তাগুতের গোলামি করা থেকে বিরত থেকেছে ..."।[৭]

এই আয়াতে الطَّاغُوتِ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[৫] সূরা আন- নিসা; ০৪: ৬০
[৬] সূরা আল-বাকারাহ;০২: ২৫৭
[৭] সূরা আয-যুমার ; ৩৯: ১৭

তাগুত-এর পারিভাষিক অর্থ:

আসুন! এবার আমরা দেখে নেই শরীয়তের পরিভাষায় তাগুত কাকে বলে?

তাগুতের সংজ্ঞার ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতভেদ তুলে ধরার পর ইমাম ইবনে জারীর রাহিমাহুল্লাহ তাগুত শব্দের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন-

والصواب من القول عندي في"الطاغوت". أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

'আমার মতে তাগুতে সঠিক সংজ্ঞা হলো- সেই হলো তাগুত, যে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতিরেকে তারই উপাসনা করা হয়—হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। এই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোনো পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোনো বস্তু'।[৮]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাগুতের ব্যাখ্যায় বলেন-

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله [إعلام الموقعين 50/1].

'তাগুত হলো—যার ব্যাপারে বান্দারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে। হতে পারে তার উপাসনা করা হয়, অনুসরণ করা হয় অথবা আনুগত্য করা হয়। সুতরাং, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হলো সেই ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিপরীতে লোকেরা যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে যার উপাসনা করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ

[৮] তাফসীরে তবারী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২১

না করে যার অনুসরণ করে। বা যে বিষয়ে আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য সেখানে আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয়।

বর্তমান তাগুতদের অবস্থা এবং তাদের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা নিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিমুখ হয়ে তাগুতের ইবাদতে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছে। কুরআনের আইন অনুসারে বিচার চাইবার বদলে তারা তাগুতের কাছে তাগুতের বানানো বিধান অনুযায়ী বিচার চাইছে। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ﷺ অনুসরণ ও অনুকরণ থেকে বিমুখ হয়ে তাগুতের অনুসরণ-অনুকরণ করছে।

এবারে আসুন, মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের রিদ্দাহ্ ও কুফরের কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাদের কুফরের বহুবিধ কারণের মধ্যে আমরা কেবল সর্বাধিক সুস্পষ্ট কারণগুলোকে এখানে উল্লেখ করব। যাতে পাঠক খুব সহজেই শক্ত দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমে এ সমস্ত বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ গোষ্ঠীর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন।

প্রথম কারণ: তারা নিজেদের জন্য আইন প্রণয়ন, আল্লাহর আইনের বিপরীতে অন্য আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা এবং দয়াময় আল্লাহর শরীয়তকে শয়তানের শরীয়ত দ্বারা পরিবর্তন করার অধিকার ও বৈধতা সাব্যস্ত করেছে।

উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত, যে ব্যক্তি সর্বসম্মত কোনো হারামকে হালাল করবে অথবা সর্বসম্মত কোনো হালালকে হারাম বানাবে, সে কাফের, মুরতাদ। যে ব্যক্তি দ্বীনের কোনো একটি বিধানকে অস্বীকার করবে, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে , তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে অথবা আল্লাহর পাশাপাশি নিজের জন্য আইন প্রণয়নের বৈধতা সাব্যস্ত করবে, সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাফের ও মুরতাদ।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه ﴿التوبة: ٣١﴾

‘তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’।[৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿الأنعام: ١٢١﴾

‘যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে আদেশ দেয় যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’। [১০]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿الشورى: ١٠﴾

“আর তোমরা যে কোনো বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার ফয়সালা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। 'ইনিই আল্লাহ্, আমার প্রভু, তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি”। [১১]

তিনি আরও ইরশাদ করেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة: ٤٤﴾

‘আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। [১২]

---

[৯] সূরা তাওবা;০৯ : ৩১
[১০] সূরা আন‘আম;০৬ : ১২১
[১১] সূরা আশ শূরা; ৪২: ১০
[১২] সূরা আল মায়েদাহ ;০৫: ৪৪

একই সূরায় অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة: ٥٠﴾

'তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে? [১৩]

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿الشورى: ٢١﴾

'তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?[১৪]

আরও ইরশাদ করেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٤٠﴾

'শাসন চলবে একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও গোলামী করবে না। এটাই সুসংহত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'। [১৫]

ইমাম আবু ইয়া'লা বলেন,"যে ব্যক্তি (কুরআনের) দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহর কোনো হারামকে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিংবা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বলে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করবে, সে কাফের। যেমন- কেউ মদ্য পানকে মুবাহ (জায়েজ) মনে করল। নামায, রোযা অথবা যাকাত আদায় না করাকে জায়েজ মনে করল। এমনিভাবে যে

[১৩] সূরা আল মায়েদাহ ; ০৫: ৫০
[১৪] সূরা আশ শুরা, ৪২: ২১
[১৫] সূরা ইউসুফ, ১২: ৪০

ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক (কুরআনের) সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দ্বারা হালাল বলে প্রমাণিত অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অথবা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক হালাল বলে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে জেনে-শুনে হারাম সাব্যস্ত করবে, মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের। যেমন, কেউ বিবাহকে হারাম সাব্যস্ত করল। আল্লাহ তা'আলা যে পন্থায় ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, কেউ সে পন্থায় ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম সাব্যস্ত করল।"

ইমাম ইবনে যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ —এই আয়াতের [১৬] তাফসীরে লিখেন- "যে ব্যক্তি স্বরচিত কোনো গ্রন্থ দ্বারা বিচার ফায়সালা করল, আর আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে দিল এবং দাবি করল, তার গ্রন্থটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, তবে সে কুফরি করল।"

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহিমাহুল্লাহ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -এই আয়াতের তাফসীরে[১৭] বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা যা তিনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং বান্দাদের মাঝে ফয়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন— তা গোপন করবে এবং তা ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবে, -فَأُولَٰئِكَ – তারাই ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করেনি। বরং তারা আল্লাহর ফয়সালাকে পরিবর্তন করেছে এবং নিজ কিতাবে অবতীর্ণ আল্লাহর হক রায় তথা সুষ্ঠু বিচার নীতিকে গোপন করেছে। هُمُ الْكَافِرُون -তারাই কাফের অর্থাৎ তারাই সে সমস্ত লোক, যারা সত্যকে গোপন করেছে; যা প্রকাশ করা ও উন্মোচন করা তাদের দায়িত্ব ছিল। তারা সত্যকে ভিন্ন কিছু দ্বারা পরিবর্তন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। সেই পরিবর্তিত পন্থা দ্বারা বিচার করেছে। বিনিময়ে তারা মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছ"।

---

[১৬] আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না।
[১৭] আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ – فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إلخ - এই আয়াতের[১৮] তাফসীরে লিখেন-

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله - تعالى - أو أوامر الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام سواءً رده من جهة الشك فيه ، أو من جهة ترك القبول ، والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة. " أحكام القرآن للجصاص"

‘এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার অথবা তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামগণের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তাঁরা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে”। [১৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,“নিশ্চয়ই মুসলিমদের সর্বসম্মত বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি দ্বীনে ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়ত ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণকে বৈধতা দান করবে, সে কাফের।”

ইমাম ইবনে রাহওয়াই রাহিমাহুল্লাহ বলেন,“মুসলিমরা একমত, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলাকে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালিগালাজ করবে, আল্লাহর অবতীর্ণ কোনো বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে অথবা কোনো নবীকে হত্যা করবে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়ে স্বীকারোক্তি দান করে।”

---

[১৮] না, তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। [সূরা আন-নিসা;০৪:৬৫]। এটি হচ্ছে পুরো আয়াতের অনুবাদ।-সম্পাদক

[১৯] আহ্কামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮১

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শাইখ বলেন,“নিঃসন্দেহে আল্লাহর অবতীর্ণ ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা দ্বারা বিচার ফয়সালাকারী কাফের। তার এই কুফরি হয়ত আকীদাগত হবে, যা তাকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে দেবে অথবা আমল সংশ্লিষ্ট হবে, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করবে না।

আকীদাগত কুফরী কয়েক প্রকারের।

তার মাঝে পঞ্চম প্রকারটি হলো সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে স্পষ্ট। আর তা হলো: শরীয়তের বিরোধিতা এবং শরীয়তের আহকামের সাথে হঠকারিতা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং আইনের ধারা প্রণয়ন, আইনের সাহায্য দান, রায় প্রস্তুতকরণ, মূল ও শাখা বিশ্লেষণ, বিচার প্রক্রিয়া গঠন, ধারা ও প্রকার বিভাজন, রায় প্রদান ও বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ—এককথায় সর্বদিক থেকে শরীয়াহ আদালতের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য গ্রহণ।

শরীয়াহ আদালতের মৌলিক নীতিমালা ও স্বতন্ত্র তথ্যসূত্র রয়েছে। যার উৎস হলো কুরআন এবং হাদীস। একইভাবে এই সমস্ত আদালতেরও বিভিন্ন তথ্যসূত্র রয়েছে, যা মূলত বিভিন্ন শরীয়ত, বিভিন্ন দেশের আইন ও বিধিমালা থেকে নেওয়া হয়। যেমন-ফ্রান্সের আইন, মার্কিন আইন, ব্রিটিশ আইন, অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসারী দাবিদার বিদা‘আতপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠির আইন ইত্যাদি। এ জাতীয় আদালত বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে প্রস্তুত রয়েছে। সেগুলোর দ্বার উন্মুক্ত। মানুষ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেসব আদালতে উপস্থিত হয়ে কিতাব সুন্নাহ বিরোধী আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মাঝে সংঘটিত বিবাদের মীমাংসা করছে। আর সে সমস্ত আইন এবং আদালত মানুষের ওপর ক্ষমতা খাটাচ্ছে। তাদের ওপর আইনি চাপ প্রয়োগ করছে। মানুষকে এই ব্যবস্থার ওপর টিকিয়ে রাখছে এবং টিকে থাকতে বাধ্য করছে। এই কুফরের চেয়ে বড় কুফর আর কি হতে পারে! 'মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল-এই মর্মে প্রদত্ত সাক্ষ্যের সঙ্গে এর চাইতে বড় সাংঘর্ষিক বিষয় আর কি হতে পারে!

দ্বিতীয় কারণ:

ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব, মাত্রাতিরিক্ত পন্থায় তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য দান এবং তাদের সাহায্য নিয়ে মুজাহিদদের ক্ষতিসাধন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এই কালিমা তথা ঈমান ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ, যা স্পষ্ট কুফরী। এর দ্বারা একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿الممتحنة: ١﴾

'মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা, রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেনো তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি ভালোভাবেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে'।[২০]

শাইখ আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন- "এ জাতীয় আয়াতে কাফের, মুশরিক ও বিজাতীয়দের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে"।

ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ জাতীয় কার্যকলাপ ঈমান বিধ্বংসী, মিল্লাতে ইবরাহীমের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং সুস্থ জ্ঞানেরও বিরোধী। সুস্থ জ্ঞানের বিচার হলো,

[২০] সূরা মুমতাহিনা; ৬০: ১

শত্রুকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করা। কারণ যে শত্রু, শত্রুতার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করে না, প্রতিমুহূর্তে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্ষতিসাধনের ফিকিরে থাকে। কেমন করে এবং কোন যুক্তিতে তাকে বর্জন না করা যেতে পারে? তাই, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : آمَنُوا- অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করো। সে লক্ষ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করো এবং যারা ঈমানের সঙ্গে শত্রুতা করেছে তোমরাও তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো। কারণ, তারা আল্লাহর শত্রু এবং মু'মিনদের শত্রু। وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ - অর্থাৎ তাদের বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হয়ো না এবং বন্ধুত্বের কারণগুলো সংঘটিত করো না। কারণ, বন্ধুত্ব স্থাপন হয়ে গেলে তোমাদের দিক থেকে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতাও শুরু হয়ে যাবে। যার ফলে তোমরা ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

কাফেরকে বন্ধু বানানো সাধারণ ভদ্রতারও খেলাপ। একজন মু'মিন কীভাবে তাঁর চিরশত্রুকে বন্ধু বানাতে পারেন, যে কিনা প্রতি মুহূর্তে তাঁর অনিষ্ট কামনা করে? তাঁর রব এবং তাঁর অভিভাবকের বিরোধিতা করে? যে রব তাঁকে কল্যাণ দান করতে চান? যে রঁব তাকে কল্যাণের পথে চলতে আদেশ দান করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন?

কাফেরদের প্রতি শত্রুতা পোষণে মু'মিনদেরকে অনুপ্রাণিত করার মত আরও একটি বিষয় হলো এ কথা চিন্তা করা যে, কাফেররা মু'মিনদের নিকট যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করে। এর চেয়ে বড় বিরোধিতা কী হতে পারে যে, তারা আমাদের ধর্মকে অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে, তোমরা পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী?"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿الممتحنة: ١٣﴾

‘মু’মিনগণ, আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে’। [২১]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সূরার শেষাংশে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন, যেমনিভাবে সূরার প্রথমাংশে নিষেধ করেছেন। অতএব, তিনি বলেন - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানসহ আরো যত কাফের গোষ্ঠী রয়েছে; যাদের ওপর আল্লাহ তা’আলা ক্রোধান্বিত, যাদেরকে তিনি লা'নত দিয়েছেন, আল্লাহর সঙ্গে যাদের রয়েছে দূরত্ব— তাদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কীভাবে তোমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারো? তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারো? তারা তো আখিরাতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। আখিরাতের জন্য যে সমস্ত নেয়ামত এবং প্রতিদানের ফয়সালা আল্লাহ তা’আলা করে রেখেছেন, তারা তা থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে!”

আল্লাহ তা’আলা আরও ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না’।[২২]

ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ নিজ তাফসীর গ্রন্থে মুফাসসিরদের একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন-

---

[২১] সূরা মুমতাহিনা; ৬০ : ১৩
[২২] সূরা আল মায়েদা; ৫: ৫১

"সর্বাধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেণীর মু'মিনদেরকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের পরিবর্তে ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানানো ও অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মু'মিনদের বিপরীতে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধতায় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত'।

আল্লাহ তা'আলা নিজ কিতাবের অন্যত্র ইরশাদ করেন-

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

﴿آل عمران: ٢٨﴾

'মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে'।[২৩]

ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন-

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফেরদেরকে সাহায্যকারী, সহযোগিতাকারী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে সকল মু'মিনকে নিষেধ করেছেন। এ কারণেই ইয়াত্তাখিজি (يَتَّخِذِ) শব্দটি মাকসুর (مكسور) হয়েছে। কারণ নাহি (نهي) হওয়ার কারণে উক্ত শব্দটি জযম (جزم) এর স্থানে রয়েছে।[২৪] নিষেধাজ্ঞা সূচক ক্রিয়াপদের শেষ অক্ষরে জযম (ْ) দেয়া হয়ে থাকে।) তবে ইয়াত্তাখিজি (يَتَّخِذِ) শব্দটির শেষ অক্ষর জাল (ذ) এর পরবর্তী অক্ষরেও সুকুন (سكون) তথা ইয়াত্তাখিজি (يَتَّخِذِ)

---

[২৩] সূরা আলে ইমরান, ৩: ২৮
[২৪] আরবি ব্যাকরণের বিশেষ একটি নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জযম হওয়ার কারণে ইজতিমায়ে সাকিনাইন (اجتماع ساكنين) এর ফলে জাল (ذ) এ জের দেওয়া হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো: হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে এমন সাহায্যকারী ও সহযোগী বানিও না যে, তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিষয়ে সাহায্য করবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের গোপন তথ্য সরবরাহ করবে। যে ব্যক্তি এমনটা করবে, فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ-এ অংশের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এবং নিজ ধর্ম ত্যাগের কারণে ও কুফরের সীমায় পা রাখার কারণে তার সঙ্গেও আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً - তবে সেই অবস্থা ব্যতিক্রম, যখন তোমরা তাদের অধীনে থাকো। আর এ কারণে তোমরা নিজেদের প্রাণের ভয় করো। তাই, তোমরা মুখে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করো এবং মনে মনে শত্রুতা পোষণ করো। এমন অবস্থাতেও তোমরা, তারা যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা সমর্থন করো না এবং কোনো কাজ দ্বারা তাদেরকে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।”

বর্তমান মুসলিম শাসকদের অবস্থা চিন্তা করলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তারা ইহুদি খ্রিস্টানসহ অন্যান্য কাফের গোষ্ঠীর সাথে সম্ভাব্য সকল পন্থায় বন্ধুত্ব করছে। তাদের বিমান ঘাঁটিগুলো ক্রুসেডারদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে আছে। যা ব্যবহার করে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে। এসব বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করে ক্রুসেডাররা নিরীহ মুসলিমদের ওপর বোমা ফেলছে। নামধারী মুসলিম শাসকদের মালিকানাধীন ভূমিগুলো কাফের সেনাবাহিনীর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে আছে। এগুলোকে নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে তারা মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম, মুসলিম, জিহাদ এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে এই মুরতাদ গোষ্ঠী সরাসরি আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। দুর্ভোগ তাদের জন্য! শত দুর্ভোগ তাদের জন্য!!

এই মুরতাদ গোষ্ঠী পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের ওপর আগ্রাসী ইহুদি তৎপরতাকে সমর্থন করছে। তারা ইহুদিদের রক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে, নিষ্ঠাবান পুলিশ হয়ে এবং বিশ্বস্ত প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ধ্বংস তাদের জন্য!!

এ সমস্ত শাসকবৃন্দ আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছে, রিদ্দা'র যে সমস্ত কারণ তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো গণনা করতে গেলে রাত পার হয়ে যাবে। হতবাক হয়ে আমরা আবিষ্কার করব, ঈমান-ভঙ্গের এমন কোনো কারণ অবশিষ্ট নেই, যা তাদের মাঝে পাওয়া যায় না। তারা কুফরে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, প্রত্যাবর্তনের আশা আদতে দুরাশার শামিল।

এই আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। ইনশা আল্লাহ্ হেদায়েত প্রত্যাশী ব্যক্তির সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাবার জন্য এতোটুকু আলোচনায় যথেষ্ট । আর আল্লাহ্ তা’আলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।

ইসলামী আন্দোলনসমূহ: ইসলামী সমাজ নির্মাণে তাদের কর্মপদ্ধতি

বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন এলোমেলো পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এক সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। এই অবস্থায় তাদের চিন্তাধারা, মানহাজ এবং মত অনুসারে ইসলামী সমাজ নির্মাণের অনেকগুলো পথ ও পন্থা রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়ে যাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করেছেন, তাঁদের কাছে এই সমস্ত জামাতের দুর্বলতা, ভঙ্গুর কর্মপন্থা ও কার্যক্রমের অসারতা একদম স্পষ্ট। এ বিষয়গুলো এক পাশে রাখলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, তারা এলোমেলো পদক্ষেপের এমন এক প্যাঁচ ও গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে, যা কখনোই কোনো উপকার বয়ে আনবে না। আর এর ফলে মুখলিস যুবকদের শ্রম ও শক্তি বৃথা হয়ে যাচ্ছে, যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

আল্লাহর দ্বীনের খাদেম হে প্রিয় ভাই! আমরা কথা বাড়াব না। ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সরল ও সঠিক পথের বর্ণনা দেবার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে কতিপয় ইসলামী দলের মানহাজ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এ দলগুলো কয়েক যুগ ধরে এবং কয়েক দশক যাবৎ ইসলামী সমাজ নির্মাণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন বা প্রাপ্তি তারা লাভ করতে পারেনি। তাদের মানহাজ নিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো: এমন মানহাজের অসারতা স্পষ্টরূপে তুলে ধরা, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত আদর্শ ও পদ্ধতির পরিপন্থী।

ভূমিকা:

নিষ্ঠাবান তাওহীদবাদীদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো, কোনো একটি বিষয় গ্রহণ করার পূর্বে বা কোনো বিষয়ে অগ্রসর হবার পূর্বে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ হুকুম ও ফয়সালা জেনে নেওয়া।

কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন'।[২৫]

মুমিনের দায়িত্ব হলো, তাঁদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ প্রতিটি বিষয়কে শরীয়ত দিয়ে বিচার করা। এবিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء: ٥٩﴾

'অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করো, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম'।[২৬]

একজন মুসলিম যখন এই বিষয়টি জানবেন, তখন তাঁর জন্য আবশ্যক হল নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আত্মসমর্পণ করা যদি

[২৫] সূরা আল হুজুরাত; ৪৯ : ১
[২৬] সূরা আন নিসা; ৪: ৫৯

সত্যিই তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবেসে থাকেন। মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজ প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿الأحزاب: ٣٦﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়'। [২৭]

আল্লাহর শপথ করে বলছি হে ভাই! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা বিরোধী যেকোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর অনুসরণ এবং সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত অনুসরণ আমাদের জন্য যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন! আমাদের যা শেখানো হয়েছে এবং আমাদের শাসকেরা আমাদের যা আদেশ করেছে তার বিপরীত হোক না কেন! কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে আমাদের এই দ্বীন যার ওপর নেই, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে।" [২৮]

ইমাম নববী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,"আরবদের নিকট 'الردّ' মূলত: 'المردود'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য। এই হাদীসটি ইসলামের একটি মৌলিক নীতি। এটি নবীজি ﷺ- এর জাওয়ামি'উল কালিম তথা সমন্বিত অর্থবোধক বাণীসমূহের একটি। উক্ত বাণীতে সব রকম

[২৭] সূরা আল আহযাব; ৩৩ : ৩৬
[২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৫৯০

বিদ'আত, কুসংস্কার ও নব উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে”।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ "জামে' আল'উলুম ওয়াল হিকাম" গ্রন্থে লিখেছেন-

“এই হাদীসের শাব্দিক পাঠ হলো, যে বিষয় আমাদের দ্বীনে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। হাদীসটির অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, যে বিষয় আমাদের দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, তা প্রত্যাখ্যাত নয়। উক্ত হাদীসে "أمر" তথা "বিষয়" বলে বোঝানো হয়েছে 'দ্বীন ও শরীয়ত'। যেমন অন্য এক হাদীসে এসেছে — مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ অর্থাৎ-আমাদের এই দ্বীনে যে ব্যক্তি নতুন কিছু আনবে, তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে।[২৯]

অতএব, সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ালো, যে ব্যক্তির কাজ শরীয়ত বহির্ভূত হবে, যে কাজ শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত না হবে, তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে। আর নবীজি ﷺ এর এই উক্তি لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, সকল কর্ম সম্পাদনকারীর কার্যাবলী শরীয়তের আলোকে বিধিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। আদেশ-নিষেধ প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের ফয়সালার অনুরূপ হওয়া অনিবার্য। অতএব, যে ব্যক্তির কাজ শরীয়ত সমর্থিত হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যার কাজ শরীয়ত বহির্ভূত হবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

মুসলিমের কর্তব্য হলো: সত্যকে গ্রহণ করা, যদিও তা নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে জেনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করা; কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে না নেওয়া। কারণ, সত্য প্রত্যাশী ব্যক্তিকে সত্যের অনুকূল বাণীই সন্তুষ্ট করতে পারে। অপরদিকে বাতিলের পক্ষে অবস্থানকারীকে সে কথাই সন্তুষ্ট করতে পারে, যাতে তার নিজের বড়ত্বের আলোচনা রয়েছে। আর এর বাইরে যা কিছু হবে, বাতিলের পক্ষে অবস্থানকারী কখনোই তা গ্রহণ করতে পারে না।

---

[২৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৫৮৯

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“নেতৃত্বের অভিলাষী ব্যক্তি —যদিও তা অন্যায় অভিলাষ হয়—এমন কথাই পছন্দ করে, যাতে তার বড়ত্বের আলোচনা রয়েছে, যদিও তা ভুল হোক না কেন। একইভাবে, এমন কথায় সে রেগে যায়; যে কথায় তাকে তিরস্কার করা হয়েছে, যদিও তা সত্য হোক না কেন। অপরদিকে মু’মিন ব্যক্তি সত্য কথা শুনে খুশি হন, চাই সে কথা তাঁর পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে। একইভাবে তিনি ভুল কথা অপছন্দ করেন, চাই তা তাঁর পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সত্য-সঠিক ও ন্যায়কে পছন্দ করেন এবং অন্যায় অসত্যকে অপছন্দ করেন”।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন: বিপ্লবের মূলনীতি

এ দলটি বর্তমানে এক বিরাট চিন্তার কারণ। অধিকাংশ পশ্চিমা গবেষক ও তাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী এটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী সবচেয়ে জুতসই উদাহরণ। ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার সবচেয়ে উত্তম বিকল্প, যার সাথে নির্বিঘ্ন নির্ঝঞ্ঝাট সহাবস্থান সম্ভব। বিশেষ করে ৯/১১-এর বরকতময় ঘটনার পর। এ হামলা তাদের দৃষ্টিতে উগ্রতা। কোনো অবস্থাতেই যার সাথে সহাবস্থান সম্ভব নয়।

আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সবদিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। আমরা কেবল এ দলটির পরিবর্তন আনার যে পন্থা, তা নিয়েই আলোচনা করতে চাই। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এটিই। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের পথে প্রচেষ্টাকারী ভাইয়েরা যেন নববী আদর্শ বিরোধী ও আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত এই মানহাজের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। কারণ, ইখওয়ানুল মুসলিমিন দলটি শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য এমন এক পন্থা অনুসরণ করেছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ সত্যপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের শুরু হয়েছে "আল জিহাদু সাবিলুনা" স্লোগান দিয়ে আর তাদের শেষ শিরকী গণতন্ত্র দিয়ে।

গণতন্ত্রের মূল কথা হলো, জনগণ জনগণকে শাসন করবে। জনগণই শরীয়ত রচনা করবে। জনগণই নীতি নির্ধারণ করে শাসন করবে। জনগণই কোনো কিছুকে হালাল (আইনানুগ) সাব্যস্ত করবে। কোনো কিছুকে হারাম (বেআইনি) সাব্যস্ত করতে হলে তাও জনগণই করবে। জনগণের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে কোনো ক্ষমতাই নেই এই মতবাদে, যদিও তা আল্লাহর ক্ষমতা হোক না কেনো। জনগণের শাসনের উপরে অন্য কারো শাসন হতে পারে না, যদিও তা আল্লাহর শাসন হোক না কেনো। জনগণের ইচ্ছার বাইরে অন্য কারো ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য নয় এই গণতন্ত্রে, যদিও তা আল্লাহর ইচ্ছা হোক না কেনো। প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কুফরী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অভিশপ্ত এই গণতন্ত্রের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা কী, তা জ্ঞানী চক্ষুষ্মান সত্যান্বেষীদেরর কাছে সুস্পষ্ট। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বেখবর ও অসচেতন নন। তারা অব্যাহত ও অবিশ্রান্তভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফয়সালা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এতে প্রবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে চলেছেন। এসব কিছু তাঁরা করছেন কেবলই এর ভয়াবহতা এবং বিরাট অনিষ্টের কথা বিবেচনা করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে এ থেকে হেফাজত করুন! (আমীন)

নিম্নে গণতন্ত্রের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা এবং দ্বীন ইসলাম ও মিল্লাতে ইবরাহীমের সঙ্গে এর সাংঘর্ষিকতা প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করা হলো:-

প্রথম বিষয়:

গণতন্ত্র এমন একটি মতবাদ, যার মূল ভিত্তি হলো, জনগণ অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আইনের উৎস। আল্লাহ নয় বরং তাদেরই রয়েছে আইন প্রণয়নের অধিকার। আর এটাই সর্বাধিক সুস্পষ্ট জঘন্য এক শিরক। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাথে সাংঘর্ষিক সর্বাধিক জঘন্য বিষয় এটাই। কারণ, কালিমার দাবি হলো, শাসন এবং আইন প্রণয়নের একক অধিকার আল্লাহর, এই অধিকারে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কারো কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿المائدة: ٤٩﴾

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদের নিজেদেরই কোনো

গুনাহের জন্য তাদের কোনোরকম মসিবতে ফেলতে চান। মানুষের মাঝে (আসলে) অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য'।[৩০]

অন্যত্র তিনি আরও ইরশাদ করেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿الشورى: ٢١﴾

'এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্য কোনো জীবন বিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দান করেননি'? [৩১]

দ্বিতীয় বিষয়:

গণতন্ত্র একটা নতুন ধর্মের মতো। এটা একেবারেই স্পষ্ট। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র নামক এই মতবাদে, বিরোধ নিষ্পত্তি ও বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে বিচারক হচ্ছে জনগণ এবং তা এককভাবেই। এ কারণে কোনো অবস্থাতেই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া বৈধ নয়। জনগণই বিচারকারী, জনগণই আইন নির্ধারণকারী। সন্দেহ নেই উপরে যা বলা হলো তা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ তথা ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। কারণ, এই কালিমার প্রতি ঈমান আনার অন্যতম একটি দাবি হলো, সব রকম বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿النساء: ٥٩﴾

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ

---

[৩০] সূরা আল মায়েদা; ৫: ৪৯
[৩১] সূরা আশ শুরা, ৪২: ২১

তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা'।[৩২]

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿الشورى: ١٠﴾

'আর তোমরা যে কোনো বিষয়েই মতভেদ করো না কেনো তার রায় তো আল্লাহ্‌রই নিকট। ''তিনিই আল্লাহ্, আমার প্রভু, তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি'।[৩৩]

তৃতীয় বিষয়:

গণতন্ত্র একটি সমসাময়িক আধুনিক ধর্ম। এতে ধর্ম, রাষ্ট্র এবং সামগ্রিক জীবন থেকে পৃথক। ধর্ম কেবল মসজিদ ও উপাসনালয়ে ইবাদাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, রাজার শাসন জমিনে, আল্লাহর শাসন আসমানে। এর স্লোগান হলো, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার? তা তো হতেই পারে না(!) আর এটাই অভিশপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলকথা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

'অতপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো

---

[৩২] সূরা আন নিসা ,০৪: ৫৯
[৩৩] সূরা আশ শূরা; ৪২: ১০

আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ'। [৩৪]

তিনি আরও ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿النساء: ١٥٠﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿النساء: ١٥١﴾

'যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলদের মাঝে (এই বলে) একটা পার্থক্য করতে চায় যে, আমরা (রাসূলদের) কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে অস্বীকার করি, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।এরাই হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি এ কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। [৩৫]

চতুর্থ বিষয়:

গণতন্ত্র একটা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার মতো, যা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন কর্মের কথা বলে। গণতন্ত্রের ছায়ায় যে কারো যা ইচ্ছা করার অধিকার রয়েছে। ব্যক্তির অধিকার রয়েছে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবার। অধিকার রয়েছে অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হবার। যতক্ষণ সে গণতন্ত্রের অধীনে থাকবে, তার এ জাতীয় যেকোনো কিছু করার অধিকার রয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব আল্লাহর সে সমস্ত বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, তিনি পছন্দ করে যেগুলো আমাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন এবং সাত আসমানের ওপর থেকে সেগুলো পালনের নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

---

[৩৪] সূরা আনআম; ৬: ১৩৬

[৩৫] সূরা আন নিসা; ৪: ১৫০-১৫১

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٣٨﴾

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী'।[৩৬]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٢﴾

'ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে মজুদ থাকে'। [৩৭]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"যে নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করো।"[৩৮]

পঞ্চম বিষয়:

গণতন্ত্রের কথা হলো, শাসক নির্বাচনের সম্পূর্ণ অধিকার জনগণের। জনগণ যদি কোনো খ্রিস্টানকে, ইহুদিকে অথবা নাস্তিককে নির্বাচিত করে, তাহলে সে-ই

---

[৩৬] সূরা আল মায়েদা; ৫: ৩৮
[৩৭] সূরা আন-নূর; ২৪: ২
[৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৫২৪

শাসক বলে বিবেচিত হবে। আর সন্দেহ নেই যে, এই নীতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর সুস্পষ্ট বিরোধিতা-

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿النساء: ١٤١﴾

'আর কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলিমদের ওপর বিজয় দান করবেন না'।[৩৯]

কাজী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"উলামায়ে কেরাম একমত, কোনো কাফেরের জন্য শাসনভার ও নেতৃত্ব সাব্যস্ত হয় না। যদি (মুসলিম) শাসকের ওপর কুফর আপতিত হয়, তবে সে (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) বরখাস্ত হয়ে যায়।"

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্র এমন একটি ধর্ম, যা কোনো অবস্থাতেই ইসলামের সাথে যায় না। নবউদ্ভাবিত এই ধর্ম সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরি। যে ব্যক্তি এই ধর্মের প্রতি ঈমান আনবে, আমরা এইমাত্র এর যে রূপরেখা তুলে ধরেছি; তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি এক মুহূর্ত আল্লাহর দ্বীনের গণ্ডির ভেতর থাকতে পারে না। আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।

পূর্বের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে চাই, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিপ্লবী পন্থা একটি ভ্রান্ত পন্থা। ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামী সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে নববী মানহাজের সম্পূর্ণ বিরোধী এই পন্থা। আমাদের শরীয়তে উন্নত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনোই অসৎ মাধ্যমকে বৈধতা দেয় না।

পাঠকের সামনে বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরার জন্য এখানে আমরা ইখওয়ানের কতিপয় আদর্শিক গুরুর বক্তব্য উল্লেখ করতে চাই। এতে পাঠক এই জামাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ। সে সমস্ত বক্তব্যে দেখা যাবে, শরীয়তের কত অকাট্য মূলনীতি, স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ও সর্বসম্মত বিধিমালার বিরোধিতায় লিপ্ত এই দল; যে সমস্ত মূলনীতি ও বিধি কিছুতেই শাসন ক্ষমতায় পৌঁছার জন্য প্রতিযোগিতার নীতিকে সমর্থন করে না।

[৩৯] সূরা আন নিসা,৪ : ১৪১

"আল-আলম" ম্যাগাজিনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রধান মুরশিদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “মিশরীয় রাজনীতিতে নীতিনির্ধারক হিসেবে জামাল আব্দুন নাসরের দর্শন কী?”

এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান মুরশিদ বলেছিলেন, “অধিকার সকলের। স্বাধীনতা সকলের। ন্যায়বিচার সকলের...!”

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, প্রধান এই মুরশিদ কীভাবে বহু ধর্মের মিশরীয় জনগণকে এক পাল্লায় মাপছেন! সর্বক্ষেত্রে কীভাবে তাদেরকে সমঅধিকার দিচ্ছেন! মিশরীয় জনগণের মধ্যে যার ইচ্ছা সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হতে পারে! সংবিধান এমন অধিকার নিশ্চিত করে তার দায়িত্ব নেবে। ইখওয়ানের গণতন্ত্র এমন মুরতাদ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে! যার ইচ্ছা সে অশ্লীলতায় জড়াতে পারবে! গণতন্ত্রের ছায়ায় যে কারো এমন অধিকার রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই(!) আল্লাহর শপথ! দ্বীনে ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের কাছে এমনটাই তো চায়। তাদের ইচ্ছা তো এটাই যে, তারা উম্মতকে দ্বীন থেকে দূরে সরাবে এবং দ্বীনের বিধিবিধানকে উঠিয়ে দেবে। তাদের আকাঙ্ক্ষা তো এটাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি “যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে তোমরা হত্যা করো”—'র মত অকাট্য বিধিমালাকে রহিত করবে।

প্রধান মুরশিদকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "অনেকেই বলে থাকে, ইখওয়ান গণতন্ত্রের শত্রু। তারা অসাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। এই অপবাদ খণ্ডনে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং এটাকে আপনারা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?"

তখন তিনি জবাব দেন, “যে এমন কথা বলে তার আসলে ইখওয়ান সম্পর্কে জানা-শোনা নেই। তারা দূর থেকে ইখওয়ানকে এমন অপবাদ দেয়। আমরা সর্বতোভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে রয়েছি। আমরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ গণতন্ত্র চর্চা করি। সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যকে আমরা খারাপভাবে দেখি না।”

প্রিয় পাঠক! স্মরণ করুন, অভিশপ্ত এই গণতন্ত্রের ব্যাপারে আল্লাহর যে ফয়সালা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, তা কী ছিল! তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন, এই দলটি জনগণের আইন প্রণয়নের অধিকারের ব্যাপারে সম্মত। এবং

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর একক অধিকারে জনগণের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি দানকারী। তার ওপর ইখওয়ানুল মুসলিমিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই উক্তির ওপর জনগণকে প্রাধান্য দিচ্ছে—

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة: ٥٠﴾

'তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে'?[৪০]

"আল-মুসাওওয়ার" ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রধান মুরশিদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনারা কি পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী?"

জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আর গণতন্ত্রই যেহেতু মানবরচিত সর্বোপযোগী ব্যবস্থা, যেখানে স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি রক্ষা হয়, তাই এর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই।"

হে পাঠক! দেখতেই পাচ্ছেন গণতন্ত্রের সাথে উনার কোন বিরোধ নেই। অথচ তিনি স্বীকার করছেন, গণতন্ত্র মানব রচিত ব্যবস্থাসমূহের একটি। তিনি মনে হয় আল্লাহর এই আয়াত পড়েননি—

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿المائدة: ٤٩﴾

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি

[৪০] সূরা আল-মায়েদা;৫ : ৫০

তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান'। [৪১]

আল্লাহর ফয়সালা বিরোধী জাহেলি বিধি-বিধানের আলোকে বিচার-ফয়সালা কামনাকারীর ব্যাপারে ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ'র এই উক্তি বুঝি তার কর্ণকুহরে পৌঁছেনি— "নিশ্চয়ই এমন কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর শরীয়তের প্রতি কুফরি। তারা আদম আলাইহিস সালামের আনীত শরীয়ত থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আগত সকল শরীয়তের প্রতি কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামী হুকুম-আহকাম কবুল না করবে, ইসলামী শরীয়তের সামনে আত্মসমর্পণ না করবে, পবিত্র এই শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা না করবে এবং সকল তাগুতি সংবিধান থেকে বেরিয়ে না আসবে, এদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক।"

হে ইখওয়ানের যুবকেরা! একটু চিন্তা করো... তোমাদের প্রয়াত আদর্শিক নেতার কথা। তার বক্তব্যকে শরীয়ত দ্বারা বিচার করো। তাতে তোমাদের জন্য সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে, যদি সত্যিই তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও। আর হ্যাঁ, এটা কেবল তার নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত বক্তব্য নয়, বরং তিনি তার এই বক্তব্যে তোমাদের মানহাজ এবং যে জামাতের সঙ্গে তোমরা যুক্ত রয়েছ, সে জামাতের মানহাজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়, "ক্ষমতা গ্রহণের পর রায় প্রদানের কর্তৃত্ব কাদের হাতে থাকবে? আহলুল হাল্ল্ ওয়াল 'আক্বদের[৪২] হাতে নাকি সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাংসদদের হাতে?"

---

[৪১] সূরা আল-মায়েদা; ৫: ৪৯

[৪২] **আহলুল হাল্ল্ ওয়াল 'আক্বদ –**

অর্থাৎ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন উলামা, নেতৃত্বস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হওয়ার উপযুক্ত বিশিষ্ট মুসলমানদের একটি জামাতকে আহলে আল-হিল্ল ওয়াল আকদ বলা হয়। মুসলিমদেরর প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হওয়ার উপযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি জামাতকে আহলে আল-হিল্ল ওয়াল আকদ বলা হয়।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেন:

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের যোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা। দ্বিতীয়ত, এতটুকু ইলম থাকা আবশ্যক, যদ্বারা তিনি বুঝতে পারবেন, খিলাফতের শর্তগুলোর ভিত্তিতে কে

জবাবে তিনি বলেন, “ক্ষমতা দখলের আলাদা কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তবে জনগণ আমাদেরকে নির্বাচিত করলে, আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান করি না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে জনগণের অভিব্যক্তির যথোচিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সংসদীয় পদ্ধতিই সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম।”

যদি আপনাদের ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা নাই থাকে, তবে আলাদাভাবে জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার উদ্দেশ্যটা কী? আর স্পষ্টভাবে আপনারা বলুন তো, জনগণ কবে আপনাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষমতার আসনে বসাবে? আর বিনামূল্যে (!) ক্ষমতার আসনে বসানোর জন্য আপনাদের এবং জনগণের মাঝে দোভাষীর কাজ কে করবে? পূর্বের ইতিহাসগুলো থেকে কী আপনাদের জন্য শিক্ষার কিছুই নেই?

হারাকাতুল মুকাওয়ামা আল ইসলামীয়া বা হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আহমদ ইয়াসিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ফিলিস্তিনি জনগণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায়। আপনারা কেন তাদের বিরোধিতা করেন”?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, “আমিও তো একটি বহুজাতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল নির্ধারিত হবে।”

তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়, "যদি সমাজতান্ত্রিক দল জয় লাভ করে, তখন আপনার অবস্থান কী হবে?"

তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, “যদি সমাজতান্ত্রিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে, ওই অবস্থাতেও আমি ফিলিস্তিনি জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করব”।[৪৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আপনাকে ক্ষমা করুন হে শাইখ! কীভাবে আপনি এমন শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন, যাদের ঘোষণা হলো, স্রষ্টা বলতে কিছু নেই। যারা মনে করে, এই জীবন একটি বস্তু মাত্র। এই কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন? শিরক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন

খলিফা হওয়ার যোগ্য। তৃতীয়ত, সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা থাকা, যার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, কে খলিফা হওয়ার উপযোগী এবং উম্মাহর কল্যাণ বিষয়ে অধিক উপযুক্ত ও সজাগ। (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা)

[৪৩] আজ জাহিরাতুল মু’জিযাহ ওয়া উস্তরাতুত তাহাদ্দি -আহমাদ ইয়াসিন, প্রকাশনা- দারুল ফুরকান, পৃষ্ঠা: ১৬-১৮

ইসলামের মানহাজ কি এই! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদের মাঝে কি আপনাদের জন্য উত্তম আদর্শ নেই?

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿المتحنة: ٤﴾

"তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা, তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশ্যে বলা কথাটি (ব্যতিক্রম,যখন সে বলেছিল), আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[৪৪]

হে ইখওয়ান! আল্লাহর এই বাণীকে আপনারা কীভাবে বিচার করেন?

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿النساء: ١٤١﴾

"আর কিছুতেই আল্লাহ, কাফেরদেরকে মুসলিমদের ওপর বিজয় দান করবেন না"।[৪৫]

ফুক্কাহায়ে কেরাম উক্ত আয়াত গবেষণা করে এই মাসআলা বের করেছেন যে, কোনো কাফেরের কাছে মুসলিম দাস বিক্রি করা জায়েজ নয়। কারণ, এতে মুসলিমদের ওপর কাফেরের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়। এই সাধারণ ক্ষেত্রে অবস্থা যদি

[৪৪] সূরা মুমতাহিনা; ৬০: ৪

[৪৫] সূরা আন-নিসা; ৪: ১৪১

এতটা গুরুতর হয়, তবে পুরো একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও শাসনভার কীভাবে কাফেরের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে?

তাকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়, "নির্বাচনের মাধ্যমে যখন জানা যাবে, ফিলিস্তিনি জনগণ একটি বহুজাতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায়, তখন আপনার অবস্থান কী হবে?"

তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা এ জাতির সম্মান এবং অধিকার স্বীকার করি। ফিলিস্তিনি জনগণ যদি ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তবুও আমরা তাদের ইচ্ছা ও অভিব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাব।"[৪৬]

আল্লাহর শপথ! ধ্বংস এমন মানহাজের জন্য। ইসলাম প্রত্যাখ্যান করাকে, ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়াকে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে শ্রদ্ধা জানাতে বলে যে মানহাজ ও চিন্তাধারা। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে যারা, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম অনুধাবন করেছে যারা, এমন মু'মিনদের কাছে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কেবল তরবারি ছাড়া আর কিছুই নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম দাবিদার যে কোনো জাতি অথবা গোষ্ঠী শরীয়তের পরম্পরাগত প্রকাশ্য কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক (শরীয়তের পরিভাষায় 'ওয়াজিব') যতক্ষণ দ্বীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। প্রথম দিকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে কতিপয় সাহাবী দ্বিধান্বিত থাকলেও পরবর্তীতে তাঁরা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'আপনি কীভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ তারা এই

---

[৪৬] ফিলিস্তিনের আন নাহার পত্রিকায় (সংখ্যা-৭৯৭) প্রদত্ত শাইখের সাক্ষাৎকার।

সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে যথোপযুক্ত কারণ পাওয়া গেলে সে অবস্থা ব্যতিক্রম। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে"।'

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নিশ্চয়ই যাকাত যথোপযুক্ত কারণের একটি। আল্লাহর শপথ! যদি তারা একটি রশিও দিতে অস্বীকৃতি জানায় যা নবীজির সময় দিত, তবে সেটা না দেয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার কাছে এটাই মনে হল যে, আল্লাহ লড়াইয়ের জন্য আবু বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম এটাই সত্য'।[৪৭]

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাইফুল ইসলামকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "যেকোন রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার বিষয়ে আপনাদের অবস্থান ও বক্তব্য কী? এবং যেকোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ—যার মাঝে রয়েছে সমাজতন্ত্র—ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার বিষয়ে আপনাদের অবস্থান ও বক্তব্য কী?"

তিনি জবাবে বলেন, "জনগণের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কারণ, ইসলামে মানুষের ওপর কোনো আকীদা-বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা নেই। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।"

তিনি আরো বলেন,"একটি ইসলামী সমাজের ছায়াতলে ব্যক্তিগতভাবে আমার রায় হলো, নিজ মতামত ও আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ করা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"।[৪৮]

তার বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে—যার ইচ্ছা নিজ গুনাহের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়াবে। যার ইচ্ছা নিজ কুফরীর কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করবে। যার কুফরি করার ইচ্ছা অবলীলায় আল্লাহর প্রতি কুফরী করবে। কারণ, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার!

---

[৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫২৬

[৪৮] মাজাল্লাহ আলমুজতামি' সংখ্যা- ৮৪৮, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ইংরেজি।

ওমরী[৪৯] শর্তাবলীর কোনো পরোয়া থাকবে না। আহলে কিতাবদের কোনো বিধান বাস্তবায়ন করা হবে না!

ডক্টর ঈসাম আরিয়ান বলেন, "ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট অর্থাৎ শূরা ও বহুদলীয় ব্যবস্থা। যে মৌলিক নীতির ভিত্তিতে জামায়াতুল ইখওয়ান গঠিত, তা শূরা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। তাছাড়া, ইখওয়ানের উলামায়ে কেরাম এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বরং আমরা আরও পরিষ্কার করে এভাবে বলতে চাই— ইখওয়ানুল মুসলিমিন রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে এভাবে বিবেচনা করে যে, তা ইসলামের সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যবস্থা। তবে, তারা বিশেষ কোনো ব্যবস্থাকে ইসলামের সমতুল্য মনে করে না। এই বিষয়টি শহীদ হাসানুল বান্নার পঞ্চম কনফারেন্সের প্রবন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "আমরা কেনো বারবার এ কথা জোর দিয়ে বলতে যাব যে, ইসলামপন্থীরা গণতন্ত্র বিরোধী? নিশ্চয়ই এটি বিরাট অপবাদ। আমরাই তো সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের দিকে আহ্বান করি। আমরাই তো গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করি। আমরণ গণতন্ত্রের পক্ষে থেকে অন্য সব কিছুকে প্রতিরোধ করি।"

হায় আফসোস! ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মূলকথা এবং তাঁর একক বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাকিমিয়্যাহ্-এর ক্ষেত্রে শিরকের মূলমন্ত্র এই গণতন্ত্র রক্ষার পরিবর্তে আপনি যদি মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করতেন!

প্রিয় পাঠক! ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মানহাজ দ্বারা প্রতারিত অন্য সকলের উদ্দেশ্যে আবু হামেদ গাজালি রহিমাহুল্লাহ্'র একটি উক্তি তুলে ধরতে চাই। এটি তিনি তালিবুল ইলমদের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়ে আলোচনার শুরুতে পেশ করেছিলেন-

'ছাত্রদেরকে নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে খুব কঠোরভাবে বেঁচে থাকতে হবে, যদিও অধিকাংশই সে বিষয়ে সম্মত হয়ে যায়। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর পরে সাধারণ মানুষদের আমল দেখে প্রতারিত হওয়া যাবে না। তালিবুল ইলমকে

[৪৯] উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমলে খ্রিস্টানদের জন্য উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক স্বীকৃত নীতিমালা ও শর্তাবলী।

সদাসর্বদা সাহাবাদের অবস্থা, তাঁদের সীরাত ও আমলের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ও আগ্রহী থাকতে হবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁরাই যারা সাহাবীদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সালফে সালেহীনের পথ ও পন্থা সম্বন্ধে অধিক অবগত। কারণ, দ্বীন তাঁদের থেকেই এসেছে। তাঁদের হয়েই এসেছে। তাই নবী যুগের পুণ্যবান লোকদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্য কোনো যুগের লোকদের বিরোধিতাকে আমলে নেয়া উচিত নয়।'

এ বিষয়ে এটুকুই বলতে চাই। আমরা মনে করি, এটুকু দ্বারাই উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কেউ যদি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তার জন্য থাকল মুজাহিদ শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) রচিত আল হাসাদুল মুর্‌র (الحصاد المرّ) গ্রন্থখানা। গ্রন্থটিতে এই জামাতের অনেক অসার বক্তব্যের আলোচনা এসেছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং ব্যর্থতার গণতন্ত্র

খ্রিস্টবাদী কাফির পশ্চিমা বিশ্ব কখনোই এটা মেনে নেবে না যে, ইসলামের ভিত্তি ও মূল অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। অতীতে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, নানান অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহ একথা প্রমাণ করেছে। ক্ষমতার আসন গ্রহণ করার জন্য ইসলামকে হতে হবে অন্তঃসারশূন্য, ধর্মনিরপেক্ষ, বেহাত, বিকলাঙ্গ এক বিকৃত পন্থা। এর সবচাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ইহুদিমার্কা বিকৃত তুর্কি শাসনব্যবস্থা।

ইখওয়ানের গণতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। ইতিহাস, ইখওয়ানের এ সমস্ত ব্যর্থ গণতান্ত্রিক উদাহরণে ভরপুর। সত্যান্বেষী ব্যক্তি স্মরণকালের ইতিহাসের কয়েকটি পাতা উল্টালেই হতবাক হয়ে এ জাতীয় ব্যর্থ গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন। বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের জন্য আমি এমনই কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। এসব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সে সমস্ত লোকদের, যাদেরকে বলা হয় গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী অথবা মধ্যমপন্থী[৫০] অর্থাৎ যারা আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট।

প্রথম উদাহরণ- আলজেরিয়া

আলজেরীয় অভিজ্ঞতা সর্বাধিক সুস্পষ্ট উদাহরণ, যা দ্বারা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, ইসলামপন্থীদের জন্য গণতন্ত্র কার্যকরী নয়। আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নামের দলটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইখওয়ানের নীতিমালা গ্রহণ করেছিল। এবং রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে গণতন্ত্রকে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দলটি তাদের প্রথম নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেছিল। অতঃপর ক্ষমতা গ্রহণের দিকে কিছুদূর এগোতেই খ্রিস্টান কুচক্রী মহলের প্রণোদনায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটে । নির্বাচনের ফলাফল বাতিল হয়ে যায়।

---

[৫০] মডারেট মুসলিম

দলের প্রতীক বাজেয়াপ্ত করা হয়। নেতা-কর্মীদেরকে আটক করে মরুভূমিতে নির্বাসিত করা হয়। তাদের অপরাধ হলো, নির্বাচনে কেনো তারা বিজয় অর্জন করল? আর এভাবেই জেল-জুলুমের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রহসন সমাপ্ত হয়, আর নতুন করে সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।[৫১]

হে প্রিয় ভাই! (আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন!) ভয়ানক এ সমস্ত নির্বাচনী প্রহসনের কথা একটু চিন্তা করুন।

দ্বিতীয় উদাহরণ- ফিলিস্তিন

হারাকাতুল মুকাওয়ামা আল-ইসলামীয়া বা হামাস ফিলিস্তিনের বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল বিজয় অর্জন করেছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছে? জিন শয়তানরা মানুষ শয়তানদেরকে প্ররোচিত করেছে। সারাবিশ্ব দ্রুত ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর অন্যায় অবরোধ আরোপ করেছে! এই অবরোধ আরোপের উদ্দেশ্য ছিল, জনগণকে দুর্বল করে দেয়া এবং ইহুদিদের জবরদখলকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে হামাসের রাজনৈতিক স্বীকৃতি কেড়ে নেয়া।[৫২] সেই তখন থেকে আজও পর্যন্ত গণতান্ত্রিক এই সমস্ত প্রহসনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণ- তিউনিসিয়া

আশির দশকের শেষের দিকে প্রাথমিক নির্বাচনগুলোতে ‘হিযব আন নাহদ্বা আল-ইখওয়ানি’ বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। আর এই বিজয়ের মাধ্যমেই ইসলামী এই সংগঠনের পতনের সূচনা হয়। দলটি ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং নেতা-

---

[৫১] ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে। এর দুই মাসের মাথায় ইসলামিক স্যাল্ভেশন ফ্রন্ট-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। - সম্পাদক

[৫২] এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারী। জানুয়ারীর ৩০ তারিখে আমেরিকা, রাশিয়া,জাতিসঙ্ঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দাবী করে হামাসকে অবশ্যই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সহিংসতা পরিহার করে ইসরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, এবং পূর্বে পিএ (প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল অথোরিটি, ইসরায়েল ঘেঁষা) এর সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি মেনে চলতে হবে। হামাস এই দাবীগুলো মানতে অস্বীকৃতি জানায়। পরিণতিতে ফিলিস্তিনের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়। সকল ধরণের আর্থিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০০৭ সালের জুনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সঙ্কটকালীন সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুললে ইসরায়েল এবং আমেরিকা অবরোধ তুলে নেয়। রামাল্লাহ ভিত্তিক পিএ-কে পূর্বের মতো পুনরায় আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান শুরু হয়। কিন্তু হামাসের ওপর অবরোধ জারি থাকে। -সম্পাদক

কর্মীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। জনগণের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে স্বদেশ থেকে উৎখাত করে প্রবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে হিযব আন নাহদ্বা আল-ইখওয়ানি নেতৃবৃন্দের সে সময় প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাগুত প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদীন ইবনে আলীর রোষানল থেকে আত্মরক্ষা করা।[৫৩]

চতুর্থ উদাহরণ- তুরস্ক

জাহেলী মনোভাবাপন্ন তুর্কিরা কোনো অবস্থাতেই এটা মেনে নেয়নি যে, ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় যাবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহ একাধিকবার এটা প্রমাণ করেছে। তবে এই শর্তে তারা এটা মানতে রাজি ছিল, ইসলামপন্থীদের দ্বীন থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। যদি তা না করা যায়, তবে ইসলামপন্থীদের পরিণতি হচ্ছে: কারাবরণ করা, বিতাড়িত ও দেশান্তরিত হওয়া, বিচারের মুখোমুখি হওয়া এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

নাজমুদ্দিন আরবাকান নেতৃত্বাধীন সালামা পার্টি (MSP) কয়েক দশক পূর্বে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। আরবাকান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। ইসলামী আন্দোলনের এই জাগরণের মুখে ইহুদি ভাবাপন্ন সামরিক বাহিনী সেনা-অভ্যুত্থান ছাড়া তাদের সামনে দ্বিতীয় কোনো উপায় খুঁজে পেল না। তাই তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেশে স্বৈরশাসন ফিরিয়ে আনে...।

সেনা অভ্যুত্থানের পর কয়েক বছর না যেতেই সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক প্রহসন আরম্ভ করে দেয়। সালামা পার্টি ফজিলত পার্টি নাম ধারণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সেনা নিয়ন্ত্রিত কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। আঙ্কারার সিংহাসন টিকিয়ে রাখার জন্য অযৌক্তিক বহু ছাড় দেয়া সত্ত্বেও নব্য জাহিলিয়াত-প্রিয়

---

[৫৩] আন নাহদ্বার জনপ্রিয়তা দেখে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদীন ইবনে আলী আন নাহদ্বাকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করে। ২৫,০০০ এরও বেশী নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আন-নাহদা নিজদের ইসলামী আদর্শ বাদ দিয়ে রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দলে পরিণত হয়। তাদের নেতারা ঘোষণা করে তারা শরীয়াহর জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় গিয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, এবং বিভিন্ন স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়। কিন্তু এতো ছাড় দেয়ার পরও ২০২১ সালে ঠিক আলজেরিয়া ও মিশরের মতোই পশ্চিমা সমর্থিত অভ্যুত্থানে আন-নাহদাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় - সম্পাদক

তুর্কিদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়নি তারা। সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক ক্যানভাসে নতুন চিত্র আসে। নাজমুদ্দিন আরবাকানসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিচারের মুখোমুখি হন। ইসলামী দলটি ভেঙে দেয়া হয় এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতি থেকেই নিষিদ্ধ হন।

গণতন্ত্র প্রেমিকদের অভ্যাস অনুযায়ী তুরস্কের ইসলামপন্থীরা দ্বিতীয়বার রাজনীতিতে আসার প্রচেষ্টা চালান। এবার "ওয়েলফেয়ার পার্টি" (কল্যাণ সংগঠন) নামে তারা দল ঘোষণা করেন। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে এ দল পরাজয় বরণ করে এবং অল্প সময়ের ভেতর তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত রজব তাইয়্যেব এরদোগান নতুন দল গঠন করেন, যার নাম দেন "অ্যাডালেট ভ কাল্কন্মা পার্টিসি"[৫৪] (ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন দল)। ইসলাম বান্ধব ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে তিনি দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তুর্কি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। তবে সে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর একভাবে ইসলামের লেবাস চড়ানো হয়। সবমিলিয়ে উদ্দেশ্য হল, ক্রুসেডার পশ্চিমা বিশ্বের মর্জি যেন রক্ষা হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রের মূল নিয়ন্ত্রক ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করে চলা যায়।

পঞ্চম উদাহরণ- ইয়েমেন

প্রকৃতপক্ষে ইয়েমেনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পরিণতি কলজে পোড়ানো মর্মান্তিক এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। আব্দুল মাজিদ আল-জিনদানির নেতৃত্বে ইখওয়ান ক্ষমতা গ্রহণের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই এই জামাত ইতিহাস হয়ে যায়।

তাগুত আলী আব্দুল্লাহ সালেহকে নিঃশেষ করার জন্য দশ লক্ষ সশস্ত্র ইয়েমেনি প্রেসিডেন্ট ভবন ঘেরাও করেছিল। কিন্তু আব্দুল মাজিদ আল-জিনদানির হেকমতের কারণে তা সফল হয়নি। প্রকারান্তরে, তিনি ইয়েমেনের এই তাগুতকে সুযোগ করে দিলেন মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসার জন্য। আব্দুল মাজিদ আল-

---

[৫৪] সংক্ষেপে এ কে পার্টি" বা ইংরেজিতে "Justice and Development Party (JDP)"

জিনদানির হেকমত, দশ লক্ষ সদস্যের সেই দলটি ভেঙ্গে দিল যাদের দাবি ছিল, (ইসলামী) শরীয়তই হবে আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস। এরপর সরকার গঠন হলো। জিনদানি সেদেশের উপপ্রধান হয়ে গেলেন। আর এদিকে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ষড়যন্ত্র করে সালেম আলবাইদ্ব-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্কট মোকাবেলায় ইখওয়ানকে ব্যবহার করতে লাগল। দক্ষিণাঞ্চলের নেতৃবৃন্দকে পার্লামেন্টে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করা হলো। আলবাইদ্ব ও তার অনুচরেরা ওই অবস্থায় উত্তরাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখলনা।

যুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধে ইখওয়ানের যুবকেরা ত্যাগের বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যুদ্ধে অল্প সময়ের ভেতর দক্ষিণাঞ্চল পরাজিত হল। উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে তা পুনরায় যুক্ত হলো। দ্বিতীয়বার নির্বাচন দেয়া হলো। তখন বিভিন্ন সেবামূলক মন্ত্রণালয়ের দায়-দায়িত্ব ইখওয়ানের লোকদের কাঁধে অর্পণ করা হলো। এদিকে তাদের মন্ত্রণালয়ের কাজে অর্থ খরচ করতে বাধা দেয়া হলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণের সামনে তাদেরকে ব্যর্থ হিসেবে উপস্থাপন করা। নিজেদের মন্ত্রণালয় পরিচালনায় তারা অক্ষম; অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ— মানুষকে এমনটা বোঝানো। যাইহোক, বাস্তবেই কুচক্রী আলী আব্দুল্লাহ সালেহ যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। ধীরে ধীরে ইখওয়ানের বলয় সঙ্কুচিত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ কমে এসেছে। অথচ একসময় তারা শাসন ক্ষমতা প্রায় লাভ করেই বসেছিল।

সত্য পথের হে পথিক! ব্যর্থ গণতন্ত্রের এমন উদাহরণ অনেক দেয়া যাবে। আদতেই আপনি যদি সত্য ভালোবাসেন, তাহলে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এসে মুক্তমনে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর শিরকী গণতন্ত্রের কুফল নিয়ে চিন্তা করুন। ইনশা আল্লাহ আপনি বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবেন।

হিযবুত তাহরীর আল-ইসলামী

প্রকৃতপক্ষে হিযবুত তাহরীর এবং তাদের আকীদা, চিন্তাধারা ও মতাদর্শ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। এমনিতে প্রকৃত চক্ষুষ্মানদের নিকট এই দলের অসার চিন্তা-দৃষ্টিভঙ্গি ও অযৌক্তিক, অসংলগ্ন দর্শনের বিষয়টি স্পষ্ট।

তাদের একটা বক্তব্য হল, ঈমান হল কেবল অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তাসদীকের নাম। অথচ এমন বক্তব্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাহ বিরোধী। কারণ এতে কবরের আযাব, মাসীহ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ, খলীফা মাহদীর আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ অস্বীকার করতে হয়। কারণ তারা মনে করে, 'খবরে ওয়াহেদ'[৫৫] দ্বারা নবীজি ﷺ সম্পর্কে যা জানা যাবে, তার প্রতি ঈমান আনা হারাম। তাদের এমনটা মনে করার কারণ হচ্ছে, এ দলের প্রতিষ্ঠাতা নাবহানী সাহেব হাদীসে মুতাওয়াতির[৫৬] -এর জন্য শর্ত দিয়েছেন, তার বর্ণনাসূত্রের প্রতি স্তরে পাঁচজন বর্ণনাকারী থাকতে হবে। এই শর্ত পূরণ না হলে হাদীস অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হবে না। কাজেই তার প্রতি ঈমান আনা জায়েজ নেই।

এছাড়াও তারা ফরজ বিধান জিহাদকে অকার্যকর মনে করে। তারা এভাবে বলে, 'খলীফা ব্যতীত জিহাদ নেই', 'শারীরিক প্রস্তুতি এবং অন্যান্য বস্তুগত কর্মকাণ্ডের সুযোগ নেই বলে জিহাদ হবে না'। কখনো কখনো এভাবে বলে, 'রাষ্ট্র নেই, তাই জিহাদ নেই'। এমনি আরো বহু অসংলগ্ন বক্তব্য ও চিন্তাধারার জন্য তারা বিখ্যাত।

হিযবুত তাহরীরের মানহাজের বক্রতা তুলে ধরা আমাদের এই অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা তাদের সেই মানহাজের ব্যাপারে আলোচনা করব যা এই দলটি

---

[৫৫] খবরে ওয়াহিদ- যে হাদিসের মাঝে মুতাওয়াতির হাদিসের সকল শর্ত বিদ্যমান নেই। যার বর্ণনাকারী একজন, দুইজন, তিনজন বা ততোধিক যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংখ্যা এক স্তরে অথবা সকল স্তরে তাওয়াতুরের পর্যায়ে না পৌঁছাবে। সেই হাদিস খবরে ওয়াহেদ বলেই গণ্য হবে। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে খবর ওয়াহেদের হাদিসকে অস্বীকার করা রাফেযি, খাওয়ারিজ, মুতাজিলাসহ বিভিন্ন গোমরাহ ফিরকার মত।

[৫৬] যুগ পরম্পরাগত হাদীস

বিপ্লবের পন্থা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে হিযবুত তাহরীরের কর্মপন্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আগ্রহী পাঠকগণ হিযবুত তাহরীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি, আবু বাসির শামী, ডক্টর সাদেক আমীন প্রমুখ আহলে ইলম ব্যক্তিবর্গের রচনা ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে পারেন। তাঁদের কিতাবাদিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকারী ও মূল্যবান আলোচনা রয়েছে।

হিযবুত তাহরীর: বিপ্লব সাধনে তাদের কর্মপদ্ধতি

একটি বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইসলামী সমাজ নির্মাণ করার জন্য হিযবুত তাহরীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। তাদের এসমস্ত কর্মসূচিসমূহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে পরিণত করে থাকে। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে সদস্যদের ক্রমাগত উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারে না। তারা উম্মাহকে এ সমস্ত চিন্তাধারার কথা বলে সুসংবাদ দিতে থাকে। উম্মাহ যেন এসব চিন্তাধারা গ্রহণ করে নেয় ও সে অনুসারে কাজ করে তাদের সংগঠনের সদস্য হয়ে যায়-তারা সে আহ্বান জানাতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এভাবেই তারা শাসন ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছাবে। চাই সেটা তাদের চিন্তাধারায় চলে আসা উম্মাহর বৃহৎ অংশের মাধ্যমে হোক অথবা রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান কিংবা সামর্থ্যবান অন্য যেকোন সংগঠনের কাছে নুসরাহ্ তথা সাহায্য প্রার্থনা করার মাধ্যমেই হোক।[৫৭] নুসরাহ্ কাদের কাছে তলব করা হচ্ছে? তাদের হাকীকত এবং প্রকৃত অবস্থা কী? তাদের মতে এসবের দিকে নজর দেবার কোনো দরকার নেই।

তাদের গৃহীত এই কর্মপন্থা তথা দাওয়াহ্ ও চিন্তা-ধারা প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লবের এই নীতির ব্যর্থতা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। তাদের ভাষায় এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, সামাজিক স্থবিরতা। আর এতে করে তারা শক্তি-সামর্থ্য সম্পন্ন, শান শওকত ও ক্ষমতার অধিকারী মহলের কাছে সাহায্য কামনা করতে

---

[৫৭] মুহাম্মাদ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে যেতেন, এবং বিনা শর্তে ইসলাম গ্রহনের দিকে আহ্বান করেন। গোত্রগুলো নানা কারণে এই দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করে। কেউ নেতৃত্বের শর্ত জুড়ে দেয়, কেউ ইসলাম মানতে রাজি হলেও ইসলামের জন্য আরব, পারসিক বা রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ মদীনার আনসারদের ইসলামের জন্য পছন্দ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী ﷺ ও ইসলামের জন্য মদীনাকে প্রস্তুত করেন, রাযিয়াল্লাহু আনহুম। অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশে নবী ﷺ মদীনায় হিজরত করেন। হিজবুত তাহরীর এটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা বলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নববী পদ্ধতি হল কোনো সংগঠন, রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান, সেনাবাহিনী ইত্যাদির কাছে নুসরাহ তালাশ করে। এদের সাহায্যে বা এদের মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করে তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। সামর্থ্যবান গোত্র, সংগঠন বা সেনাবাহিনীর কাছে নুসরাহ তালাশকে তারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। একে তারা জিহাদেরও শর্ত সাব্যস্ত করে। - সম্পাদক

বাধ্য হয়েছে। এই সাহায্য কামনাকে তারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য অবশ্য পূরণীয় শর্ত বলে সাব্যস্ত করেছে। হিযবুত তাহরীরের মতে, এই শর্ত পূরণ না হলে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। এসবের মধ্য দিয়ে মূলত: হিযবুত তাহরীরের ভাইয়েরা যুগের ফরজে আইন দুই বিধান ই'দাদ ও জিহাদকেই অকার্যকর করে দিয়েছে।

হিযবুত তাহরীরের উদ্ভাবিত উপরোক্ত মানহাজ যে প্রকৃত অর্থে নববী আদর্শের বিরোধী এবং সমাজ বিনির্মাণ ও জাতি গঠনে জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরোক্ত কারণ ছাড়াও অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা ব্যর্থ হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, ব্যবহারিক বাস্তব জীবনাচারও তাদের কর্মপন্থার বিপরীত। হিযবুত তাহরীর বিষয়টি এভাবে স্বীকার করেছে – হিযবুত তাহরীর দেখতে পেল, উম্মাহ তাদের আশা-ভরসার স্থল নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদের প্রতি আস্থাহীন। মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠী অন্যায়, অত্যাচার করছে। সংগঠনের যুবকদের ওপর শাসকদের অবর্ণনীয় নিপীড়ন নিগ্রহের কারণে সামাজিক পরিবেশ বিপ্লবের জন্য অনুর্বর ও স্থবির। তখন তারা এই অনুর্বরতা ও স্থবিরতা প্রতিকারে সক্ষম সামর্থ্যবান শ্রেণীর কাছে নুসরাহ্ তলবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হিযবুত তাহরীরের প্রতিষ্ঠাতা নিজ গ্রন্থ 'আত তাকাত্তুল আল হিযবী'-তে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, “তৃতীয় মারহালা হলো: শাসন ক্ষমতা গ্রহণ। সংগঠন, উম্মাহর সাহায্যে এবং নুসরাহ্ তলব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে”।

ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী হে ভাই! নিজেদের আবিষ্কৃত শর্তের ভিত্তিতে নুসরাহ্ তলবের নামে যে বিদ‘আতের কথা তারা সকাল-সন্ধ্যা আড়ম্বর সহকারে বলতে থাকে, তা বাতিল হওয়ার কয়েকটি কারণ আমরা এখানে আলোচনা করছি।

প্রথম কারণ:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আমাদের জীবনের নিশ্চিত-সম্ভাব্য, ছোট-বড় এমন কোন দিককে অবশিষ্ট রাখেনি, যেখানে ইসলামের অনুশাসন ও বিধান

নেই। এমনকি একজন মুসলিম কীভাবে মলমূত্র ত্যাগ করবে, ইসলাম সে বিষয়েও নীতিমালা দিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, ইসলামী হদ প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়নসহ সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ আরো বহু কল্যাণের ভিত্তিমূল খিলাফত ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয় সম্পর্কে কোনো রূপরেখা না দিয়ে ইসলাম কীভাবে চুপ করে থাকতে পারে?

হিযবুত তাহরীরের মতে ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য পূরণীয় শর্ত হল নুসরাহ তলব। এখন কথা হল, হিযবুত তাহরীরের আবিষ্কৃত পন্থাতেই যদি নুসরাহ্ তলবের বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকত, তবে অবশ্যই কুরআন-হাদীসে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা থাকত। আর উলামায়ে কেরামও সে বিষয়ে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করতেন। কিন্তু এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় কারণ:

হিযবুত তাহরীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সামর্থ্যবান গোত্র, সংগঠন ,সেনাবাহিনী ইত্যাদির কাছে নুসরাহ তালাশের শর্ত জুড়ে দিয়েছে। অথচ সালফে সালেহীন উলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে এমন কিছু বলেননি। অতএব, এটা প্রত্যাখ্যাত বিষয়। খিলাফতের অবসান ও বিলুপ্তি ঘটার ব্যাপারে হাদীসে বক্তব্য এসেছে। দ্বীনের উলামায়ে রাব্বানী ও পূর্ববর্তী আলিমরা তাহলে কীভাবে নুসরাহ তালাশ সংক্রান্ত আলোচনার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন? কেনো তাঁরা নিজেদের কিতাবাদিতে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও এ বিষয় কিছু উল্লেখ করেননি? আর মুহাম্মাদ ﷺ আনসারদের কাছে যে পদ্ধতিতে নুসরাহ্ তলব করেছিলেন সেটি ছিল সময়োপযোগী, বাস্তবতার দাবি এবং আরবের গোত্রীয় ও গ্রামীণ—সব রকম সামাজিক পরিস্থিতির অনুকূল। কিন্তু আমাদের বাস্তব অবস্থা ব্যতিক্রম।

আমাদের এই সময়ে তাগুতের দল, উম্মাহর ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। তাই কোনো অবস্থাতেই এই পন্থা বাস্তবায়িত করার সুযোগ নেই। বরং এতে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা রয়েছে।[৫৮] তাই এভাবে রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনী

---

[৫৮] মুসলিমদের উপর চেপে বসা শাসকগোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনী নব্য ক্রুসেডারদের গোলাম। শাসকগোষ্ঠী নিজেরা তাগুত অন্য দিকে তাদের অনুগত সেনাবাহিনী দলগতভাবে মুরতাদ। যেসব মুসলিম আল্লাহর

ইত্যাদির কাছ থেকে নুসরাহ নিয়ে ক্ষমতালাভ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তৃতীয় বিষয়:

ক্ষমতাশালী ও শৌর্যবীর্য সম্পন্ন শ্রেণীর কাছে নুসরাহ তলবের যেই পন্থা নবী করীম ﷺ অনুসরণ করেছেন, তা সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন—এমন কোনো প্রমাণ নেই। সাহাবীরা পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহর ﷺ এ কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন সে ব্যাপারেও কোনো দলীল নেই। হিযবুত তাহরীর মনে করে নুসরাহ তলব ওয়াজিব পর্যায়ের। এটা যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিবই হতো, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই তাঁর সাহাবীদেরকে স্বীয় এই কর্মনীতিতে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিতেন, যেমনিভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ব্যাপারে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ﷺ এমন নির্দেশ দেননি। হিযবুত তাহরীরের নীতিনির্ধারক মহল মুহাম্মাদ ﷺ যার আদেশ দেননি সেটাকেই ওয়াজিব বানিয়ে ছেড়েছে। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ সরাসরি যার নির্দেশ দিয়েছেন -আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ- সেটাকেই স্থবির করে দিয়েছে।

চতুর্থ বিষয়:

নবীজি ﷺ আরব গোত্রগুলোর কাছে নুসরাতের যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন, তা ছিল মাক্কী যুগে তথা মুসলিমদের দুর্বল অবস্থায়। তখন পর্যন্ত মদীনায় নবীজির নেতৃত্বে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর এ কারণেই কোনো অবস্থাতেই পিছনে ফিরে তাকানো এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নুসরাহ তলব করাকে অবশ্য পূরণীয় শর্ত বলে সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য জায়েজ হবে না। কারণ, আমরা যদি এ কাজ করি, তাহলে দেখা যাবে হিজরত এবং জিহাদ—দ্বীন ইসলামের মহান এই দুই বিধানকে আমরা অকার্যকর করে ফেলছি। অথচ এই দুই ফরজ বিধান এবং

শরীয়া বাস্তবায়ন করতে চায় এরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এরা ক্রুসেডার-জায়নবাদী এমনকি হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বুকের রক্ত ঝরাচ্ছে। কাজেই একজন মুসলিম শরীয়া আইন বাস্তবায়নের জন্য এসমস্ত তাগুত,দালালদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশা কীভাবে করতে পারে? – সম্পাদক।

উভয়ের বিস্তারিত বিধিমালা ও প্রণয়ন কাল বর্ণিত হবার মাধ্যমে এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে।

পঞ্চম বিষয়:

মুহাম্মাদ ﷺ এর নুসরাহ তালাশের স্থায়িত্ব ছিল দুই বছরের মতো। কিন্তু হিযবুত তাহরীর পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে নুসরাহ্ তলব করেই চলেছে। সাহায্য কামনা করেই যাচ্ছে। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা কি দেখে যেতে পারব, সামর্থবানদের থেকে তারা সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছে?

ষষ্ঠ বিষয়:

আমরা সকলেই জানি, মুহাম্মাদ ﷺ অমুসলিমদের থেকে এবং মুশরিক গোত্রগুলোর থেকে সাহায্য, সহায়তা, সহযোগিতা ও সমর্থন চেয়েছেন; তাদের কাছে ইসলাম পেশ করার পর। কিন্তু হিযবুত তাহরীর, সাহায্য ও নুসরাহ লাভের জন্য এভাবে অপেক্ষা করে বসে আছে যে, খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনরত ইসলামের অনুসারীদের পক্ষ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাহায্য চলে আসবে।

প্রিয় ভাই একটু লক্ষ্য করুন! তারা একদিকে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণের দাবী করে থাকে। অপরদিকে বাস্তবে যাদের কাছে নুসরাহ তলবের কথা বলে থাকে, সেই দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা নবীজির পদ্ধতির বিরোধিতা করে!

সপ্তম বিষয়:

আমরা দেখলাম, শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতার অধিকারীদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করাকে ইসলামী সমাজ নির্মাণের জন্য অবশ্য পূরণীয় ও অনিবার্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছে হিযবুত তাহরীর। আর এর পরিণতি হচ্ছে বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত জিহাদের বিধান অকার্যকর হয়ে যাওয়া। জিহাদের শাখাগত বিধিমালা এবং এসংক্রান্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ —যা সশস্ত্র

সংগ্রামের নির্দেশ দেয়— অকার্যকর ও রহিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴿البقرة: ٢١٦﴾

'তোমাদের ওপর কিতালকে (সশস্ত্র সংগ্রাম) ফরজ করা হয়েছে'। [৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿الأنفال: ٣٩﴾

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাও যতক্ষণ ফিৎনা নির্মূল না হয় এবং দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না হয়'। [৬০]

তিনি আরও ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴿التوبة: ٣٦﴾

'তোমরা সার্বিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যেমনিভাবে তারা সার্বিকভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে'। [৬১]

এ সমস্ত আয়াত এবং এজাতীয় আরো বহু মাদানী যুগের আয়াত থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। দ্বীন ইসলামে নব-উদ্ভাবিত দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনকারী লোকদের ইচ্ছা অনুসারে আমরা এরকম অসংখ্য আয়াতকে অকার্যকর হিসেবে মেনে নিতে পারি না।

অষ্টম বিষয়:

---

[৫৯] সূরা আল-বাকারাহ ; ০২: ২১৬
[৬০] সূরা আনফাল; ০৮ : ৩৯
[৬১] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ৩৬

আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া, ইরাক এমনকি হিযবুত তাহরীরের কেন্দ্রভূমি ফিলিস্তিনে এ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিভিন্ন ফ্রন্ট, বিভিন্ন মাধ্যম তৈরি হয়েছে। আল্লাহর রহমতে এ সমস্ত রনাঙ্গণ আজ প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু এসব অঙ্গনে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো সক্রিয়তা আমরা দেখতে পাইনি। দ্বীনি মেহনতে তারা যদি আন্তরিক হতো, অন্তত আড়ম্বর সহকারে নুসরাহ তলবের যে পদ্ধতির দাবি তারা করে থাকে, তাতেও যদি তারা পুরোপুরি একনিষ্ঠ হতো, তবে এসব রনাঙ্গণ থেকে তারা সে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করত। কারণ, এসব ময়দানই তো সাহায্য প্রাপ্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্থান। কিন্তু তারা এসমস্ত ফ্রন্ট থেকে নুসরাহ তলব করেনি।

নবম বিষয়:

হিযবুত তাহরীর ১৩ বছরের অনধিক এক মেয়াদকাল নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রতিশ্রুত খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। নবুওয়্যাত লাভের পর, নুসরাহ্ প্রাপ্তির পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেছিলেন। এখান থেকেই মূলত: তাদের এই মেয়াদকাল নির্ধারণ। তাদের নির্ধারিত এই মেয়াদকাল পার হয়ে গিয়েছে অথচ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি । এরপর তারা আবারও অনুরূপ মেয়াদকাল নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয়বারও লক্ষ্যে পৌঁছানো ছাড়াই মেয়াদকাল পার হয়ে গিয়েছে। ৫৪ টি বছর এভাবে চলে গিয়েছে, কিন্তু তারা এখনো মক্কী যুগ থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। আজও তারা অপেক্ষায় রয়েছে নুসরাহ্ প্রাপ্তির।

প্রিয় পাঠক! তাদের এই হঠকারিতার কথা একটু চিন্তা করে দেখুন, তা কতটা বাস্তবতা বিবর্জিত!

দশম বিষয়:

হিযবুত তাহরীর যে নুসরাহ্'র স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে তা একদিন পূরণ হবে। তবুও তো এর জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন[৬২] যারা দুনিয়ার জীবন,খ্যাতি,ক্ষমতার লোভ, ধন-সম্পদকে অবলীলায় তুচ্ছজ্ঞান

[৬২] হিযবুত তাহরীর যাদের কাছে নুসরাহ তলব করে। -সম্পাদক

করতে পারে। এমন গুণাবলী সম্পন্ন একদল মানুষ পাওয়া বর্তমান যুগে ধরতে গেলে প্রায় অসম্ভব । কারণ, এই যুগে তাগুত গোষ্ঠী সেনাবাহিনীকে গোলাম বানিয়ে রাখে। আর উম্মাহর কাঁধে চেপে বসা তাগুত গোষ্ঠীর কর্তৃত্বে যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে, উম্মাহ ততই এ সমস্ত উচ্চ মানবিক গুণ ও উন্নত জীবনাচার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ নুসরাহ্'র জন্য এগুলো একান্তই প্রয়োজন। উপরে যে গুণাবলীর কথা বলা হলো, সাধারণ মানুষের মধ্যেই এগুলো পাওয়া দুষ্কর। হিযবুত তাহরীর খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য যাদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে আছে, তাদের মাঝে কীভাবে সেগুলো পাওয়া যেতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে, হিযবুত তাহরীর যে নুসরাহ্'র জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং আশা নিয়ে বসে আছে, তা নিছক কল্পনা ও প্রতারণার মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের দাবিকৃত এই নুসরাহ্ কেবলই একটি অজুহাত, যা তাদেরকে ফরজে আইন জিহাদকে অকার্যকর করার পক্ষে বৈধতা দিচ্ছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক— তারা মূলত: এই কাজই করে যাচ্ছে। তাদের এই নব-উদ্ভাবিত মানহাজ ইতিপূর্বে চর্চা করে গেছে রাফেজী শিয়া গোষ্ঠী ও মুরতাদ কাদিয়ানী গোষ্ঠী। তারা সকলেই জিহাদকে অকার্যকর সাব্যস্ত করেছিল।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার নিমিত্তে আমরা কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি, যা তারা নিজেদের মুখে স্বীকার করেছে এবং নিজেদের হাতে লিখেছে। এসব উদাহরণ থেকে ইনশাআল্লাহ তাদের প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। মুহাম্মাদ ﷺ-'র মানহাজ বিরোধী তাদের ভ্রান্ত মানহাজের গোপন বিষয় ফাঁস হয়ে যাবে।

ইসলামকে কেবল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ করে দ্বীনের অন্যান্য বিষয়কে[৬৩] একরকম পাশ কাটিয়ে হিযবুত তাহরীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ‘বিপ্লব সৃষ্টিতে হিযবুত তাহরীরের পন্থা’গ্রন্থে বলা হচ্ছে- “যে সমস্ত সংগঠন অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে, মূলধারার ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। খিলাফত পুনরুদ্ধার ও আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার যেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব, এসব সংগঠন কখনোই সে লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম নয়। যেমন-

---

[৬৩] বিশেষত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে।

১. যেসব সংগঠন কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন- মাদ্রাসা ও হাসপাতাল চালু, গরীব অসহায় ও দুঃস্থদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

২. যেসব সংগঠন ইবাদাত ও সুন্নাহ্ পালনে উৎসাহ প্রদানের কাজ করে থাকে।

৩. যেসব সংগঠন আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার[৬৪] করে থাকে।

৪. যেসব সংগঠন সমাজ সংশোধন এবং উন্নত চরিত্র বিনির্মাণে কাজ করে থাকে।"

এতে আরও বলা হয়, "হিযবুত তাহরীর একটি রাজনৈতিক সংগঠন যা ইসলামী চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি রূহানী পৌরহিত্যমূলক কোনো সংগঠন নয়। না এটি কোন আমলী সংগঠন। কোনো শিক্ষামূলক বা দাতব্য জনকল্যাণমূলক সংগঠনও এটি নয়।"

তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অবিবেচনাপ্রসূত। এটার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো দলীল প্রমাণ নাযিল হয়নি। এর মধ্য দিয়েই হিযবুত তাহরীর ইসলামকে তার অন্যান্য সকল অঙ্গ ও অধ্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তারা এই যুক্তি দেখায় যে, সেসবের দ্বারা ইসলাম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে না। ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক অঙ্গন ছাড়া ইসলামে যেন আর কিছুই নেই! তারা জোর করে ইসলামকে শুধু রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চায়। বলতে চায়, শুধু রাজনীতির দ্বারাই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ দলের এটা জানা নেই, ইসলাম এমনই পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা, তা তার শাখা-প্রশাখার পৃথকীকরণ মেনে নেয় না। মানহাজ, আকীদা, আখলাক, মুয়ামালাত[৬৫], ইবাদাত, আধ্যাত্মিকতা, শরয়ী রাজনীতি, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্—সবকিছু মিলিয়েই ইসলাম। কখনোই একটির বিপরীতে অন্যটিকে দাঁড় করানো, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে প্রাধান্য দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং এটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থা, যার এক শাখা অন্য শাখার জন্য পরিপূরক। যার একাংশ অন্য অংশের জন্য সত্যায়ন।

---

[৬৪] সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ।

[৬৫] লেনদেন

হিযবুত তাহরীর আরো বলে- "হিযবুত তাহরীরের সকল কার্যক্রম হচ্ছে রাজনৈতিক। শিক্ষাদানের সঙ্গে তার কার্যক্রমের সম্পর্ক নেই। অতএব, এটি কোনো মাদ্রাসা নয়। একইভাবে ওয়াজ-নসিহত এবং ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান আমাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের কার্যক্রম শুধুই রাজনৈতিক, যেখানে ইসলামের প্রকৃত চিন্তাধারা, বিধিমালা এবং নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জানানো হবে যেন সে অনুসারে কাজ করা যায়।"

আরও বলা হচ্ছে— "হিযবুত তাহরীর একটি রাজনৈতিক সংগঠন। কোনো আধ্যাত্মবাদী সংগঠন নয়। না কোনো আমলের অনুশীলনমূলক সংগঠন, শিক্ষাগত সংগঠন কিংবা কোনো দাতব্য সংগঠনও নয়।"

আরও বলা হচ্ছে- "হিজবুত তাহরীরের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক, চাই প্রত্যক্ষভাবে শাসন ক্ষমতার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা থাকুক কিংবা না থাকুক। কিন্তু কখনোই শিক্ষা-দীক্ষা তার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, এটি কোনো মাদ্রাসা নয়। ওয়াজ-নসিহত এবং ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান এই সংগঠনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর কার্যক্রম শুধুই রাজনৈতিক, যেখানে ইসলামের সঠিক চিন্তা, দর্শন ও বিধিমালা জানানো হবে তদনুযায়ী কাজ করার জন্য।"

আমি এই সংগঠনের লোকদেরকে বলতে চাই—মুফতিরা, আলেমরা, বক্তারা এবং শিক্ষকরা আপনাদের সংগঠনের সদস্য হোক, তা যদি আপনাদের আগ্রহের বিষয় না হয়ে থাকে, তবে আপনারা আসলে কাদেরকে সদস্য করতে আগ্রহী? একদল ডাকাতকে? একদল মূর্খকে? একদল চোরকে? ফিৎনা-ফাসাদ ও অনিষ্ট সৃষ্টিকারীদেরকে?? এদেরকে নিয়ে আপনারা উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন? আল্লাহর হুকুম কায়েম করবেন?? এদের সাহায্য মুসলিম সমাজ নির্মাণ করবেন?

হিজবুত তাহরীর আরো বলেছে — "নিশ্চয়ই হিজবুত তাহরীর মূলগতভাবে একটি ইসলামী সংগঠন। তবে অপরাপর ইসলামী দলগুলোর মত সাধারণ কোনো ইসলামী সংগঠন নয়। হিজবুত তাহরীর মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয় না। মুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় না। মানুষকে ইসলাম গ্রহণের উপদেশ দেয় না। কারণ, ইসলাম তো এ সংগঠনের কেবল উৎস, কর্মসূচি নয়। ইসলাম তাদের ভিত্তি, পরিচয় নয়।"

আরও বলা হচ্ছে- “এ কারণে ইসলামী দাওয়াতে নিয়োজিত সংগঠনের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, নিজেকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানো। আধ্যাত্মিকতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, আমল-আখলাক, শিক্ষা-দীক্ষা বা এজাতীয় কোনো কিছু দিয়ে নিজের কাঠামোকে সাজানো উচিত নয়। বরং অপরিহার্য হলো, কেবল রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ কারণেই হিজবুত তাহরীর— যা একটি ইসলামী সংগঠন—একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে।”

হে হিজবুত তাহরীরের ভাইয়েরা! মানুষকে যদি আপনারা ইসলাম শিক্ষা না-ই দেন, মানুষের কাছে যদি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত না-ই পৌঁছান, আমর বিল মারুফ তথা সৎকাজের আদেশ যদি না-ই করেন, নাহি আনিল মুনকার' তথা অসৎ কাজ থেকে বারণ যদি না-ই করেন, আপনাদের দলের সদস্যদের এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমের আত্মশুদ্ধির চিন্তা যদি আপনাদের মাঝে আসলেই না থাকে, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে, মানুষকে তার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ প্রদানে যদি আপনারা নিয়োজিত না হন, তবে তো আপনাদের ব্যাপারে এমনটাই বলা শোভা পায় যে, আপনারা একটি ধর্মহীন সংগঠনের সদস্য...! আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা যদি আপনাদের কর্মসূচিতে না থাকে, আপনাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, ইসলাম যদি আপনাদের পরিচয় না হয়, তবে আপনাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কী আর ইসলামের সঙ্গেই বা আপনাদের সম্পর্ক কী...!

মুহাম্মাদ ﷺ ইরশাদ করেন,

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ».

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে তবে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দিয়ে তা প্রতিহত করে। তাও

যদি না পারে তবে অন্তর দিয়ে যেন তা প্রতিহত করে। আর এটি ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা।”[৬৬]

ইমাম জাসসাস বলেন, “কুরআন এবং নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, তাতে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরজ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আমাদের আলোচনা থেকে এটিও প্রতীয়মান হলো যে, এটি ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায় এবং অন্যরা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। আর এ কারণেই এটি ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে পাপী ও পূণ্যবান লোকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি একটি ফরজ ছেড়ে দেয়, এতে অন্যান্য ফরজ দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি নামায ছেড়ে দেয়, এতে রোযার ফরজ দায়িত্ব এবং অন্যান্য ইবাদাত পালনের আবশ্যকতা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। একইভাবে কেউ যদি কোনো ভাল কাজই না করে এবং কোনো প্রকার খারাপ কাজ থেকে নিজে বিরত না থাকে, তবুও আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার তথা অন্যকে ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার ফরজ দায়িত্ব থেকে সে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না।”

হিযবুত তাহরীর আরও বলছে- “হিযবুত তাহরীর তাদের চলার পথে চ্যালেঞ্জের নীতি আঁকড়ে ধরেছে। তাদের বৈপ্লবিক পথ চলায় তারা খোলামেলা ও দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছে। বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক কোনো সক্রিয়তার পথে তারা পা বাড়ায়নি, চাই তা শাসক মহলের বিরুদ্ধে হোক অথবা তাদের দাওয়াতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী অন্য কোনো শ্রেণীর বিরুদ্ধে হোক কিংবা তারা শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে এমন যে কারো বিপক্ষে হোক। আর এমনটি তারা করে থাকে মক্কায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শিক কর্মপন্থার অনুসরণে। কারণ, তিনি মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রকার বৈষয়িক সক্রিয়তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি।”

---

[৬৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬

অন্যত্র তারা বলছে- মুসলিমদের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো, তারা নিজেদের কাজকর্ম ও চলাফেরায় ইসলামের প্রতিফলন ঘটাবে। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে ইসলামের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। তেমনি একটি নির্দেশনা হলো, খিলাফত রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের দাওয়াহ্ পেশ করা। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এই কর্মপন্থা আঁকড়ে ধরে থাকা। আর বস্তুতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা। ইসলাম নির্দেশিত শরীয়তসম্মত পন্থা এটাই। সন্ত্রাসী আখ্যা পাবার ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে বেড়ানো শরীয়তসম্মত পন্থা নয়।”

তারা আরও বলে, “ হিযবুত তাহরীর বাস্তব পরিমণ্ডলে দাওয়াহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দাওয়াহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে তারা জড়ায় না। এমনকি দাওয়াহ ভিন্ন অন্য কোনো কাজ করাকে দাওয়াতের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক বলে মনে করে থাকে। তাদের জন্য সাধারণভাবে এমন কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া একেবারেই জায়েজ নয়।”

আরও বলা হচ্ছে- “এ কারণেই এমন সংগঠন যাদের কাজ হচ্ছে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া, তাদের জন্য অন্যান্য সংগঠনের মতো দাওয়াহ ভিন্ন অন্য কোনো কাজে জড়িয়ে পড়া জায়েজ নয়। বরং চিন্তার প্রসার ও দাওয়াতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।”

হিযবুত তাহরীরের কর্মসূচিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈষয়িক সক্রিয়তা হিসাবে তারা জিহাদকে সঙ্গত মনে করে না। জিহাদের কথা বলে না এবং তা সমর্থনও করে না। জিহাদ তাদের কর্মসূচির ভেতরেই নেই। বরং এটি একটি রাজনৈতিক সংগঠন যারা শুধু রাজনীতির কথাই বলে এবং রাজনীতির জিহাদ করে। তাদের কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। শুধু তাই নয়, তারা জিহাদকে সুউচ্চ সেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক মনে করে, যার মাধ্যমে তারা সমাজ পরিবর্তন করবে ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের সেই সুউচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এটুকুতেই তারা ক্ষান্ত নয়, নিজেদের উদ্ভাবিত এই পন্থাকে তারা শরীয়তসম্মত পন্থা মনে করে। দাবী করে ইসলাম এটাকেই অনুসরণের আদেশ দিয়েছে। তাই, তাদের মতে, কোনো অবস্থাতেই এই পন্থাকে উপেক্ষা করা জায়েজ নয়। সারকথা হলো, জিহাদ তাদের

মতে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি নব-উদ্ভাবিত পন্থা এবং এই পন্থা অনুসরণ করা নববী মানহাজের বিরোধী(!)

আল্লাহর কসম! তারা যা বলছে, দ্বীন ও মিল্লাতের শত্রুরা মুসলিমদের কাছ থেকে তো সেটাই আশা করে। আর তা হল, মুসলিমরা তাদের অভিধান থেকে ফরজ জিহাদকে তুলে দেবে। এই সুযোগে শত্রুরা পশুর মতো পাইকারি হারে তাদেরকে কসাইখানায় নিয়ে যাবে।

ইবনে দাকিক আল'ঈদ বলেন,“ক্বিয়াস তথা স্বাভাবিক যুক্তির দাবি হল, উসিলা তথা উপলক্ষ্যমূলক আমলসমূহের মধ্যে জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া। কারণ, এই জিনিস আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও বিস্তার এবং কুফরীর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের মাধ্যম। আর এইসব বিষয়ের যেমন ফযিলত ও প্রাধান্য রয়েছে, তেমনি জিহাদেরও অনুরূপ ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকাটা সাধারণ যুক্তির দাবি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ”।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেন -

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ۝﴿الأنفال: ٣٩﴾

‘তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা’আলার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যায়, অতঃপর, যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তা’আলাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। [৬৭]

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেন, “অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়। এবং অংশীদারবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। যার ফলে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর বান্দাদের থেকে বিপদ দূরীভূত হয়ে যাবে —আর সে বিপদ হচ্ছে ফিৎনা'। এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর তখন আনুগত্য ও ইবাদাত

[৬৭] সূরা আল-আনফাল; ০৮: ৩৯

একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুর পূজা-অর্চনা, গোলামি পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴿التوبة: ٣٩﴾

‘যদি তোমরা বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদেরকে অন্য জাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করবেন’। [৬৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,“এই আযাব কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনও তাঁর বান্দাদের হাতে হয়। মানুষ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখন তিনি তাদেরকে এভাবে বিপদের মুখোমুখি করেন যে, পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আর এতে করেই তাদের মাঝে ফিতনার প্রাদুর্ভাব হয়। বাস্তবতা এমনই। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আত্মনিয়োগ করে, তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁদের অন্তরকে একীভূত করে দেন। তাদের মাঝে সদ্ভাব সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। এবং তাঁদের সকলকে তাঁর নিজের শত্রু ও তাঁদের শত্রুদের ওপর বিজয় দান করেন। আর যদি মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়, তবে আল্লাহ তা’আলা তাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেন। একে অন্যকে আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করার মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿السجدة: ٢١﴾

‘গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে’। [৬৯]

মানুষের হাতে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা লঘু শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা’আলা মুশরিকদেরকে আযাবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বদরের ঘটনা দ্বারা তা পূরণ করা হয়েছে।”

---

[৬৮] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ৩৯
[৬৯] সূরা আস-সাজদা; ৩২: ২১

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "এটিও প্রত্যেক প্রজন্মের প্রতি আল্লাহর সম্বোধন। এতে তিনি জানাচ্ছেন যে, যারা (আল্লাহ কর্তৃক) নির্দেশিত জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করে দেবেন, যারা জিহাদকে প্রতিষ্ঠা করবে। আর এটাই বাস্তবতা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দ্বীনের স্তম্ভ সুদৃঢ় থাকে পথপ্রদর্শক কিতাব এবং সাহায্যকারী লৌহের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলাই এমনটি উল্লেখ করেছেন। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য লাভের আশায় তাঁরই সহায়তা নিয়ে ঐশী গ্রন্থ ও লৌহের মাঝে সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হওয়া।"

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

﴿الحديد: ٢٥﴾

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও মীযান অবতীর্ণ করেছি, যেন মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে'। [৭০]

এখানে যেই ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে পথপ্রদর্শন। এরপর আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴿الحديد: ٢٥﴾

"এবং আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি"। [৭১]

এখানে যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে—সাহায্য। এভাবেই তিনি পথপ্রদর্শক কিতাব ও সাহায্যকারী লৌহের কথা নিজ কিতাবে উল্লেখ করলেন।"

---

[৭০] সূরা আল- হাদীদ; ৫৭: ২৫

[৭১] সূরা আল- হাদীদ; ৫৭: ২৫

হিযবুত তাহরীরের কি এখনো সময় হয়নি হেদায়েতের পথে ফিরে আসার? তাদের কি সময় হয়নি নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সরল-সঠিক পথ অবলম্বনের; তারা যদি সত্যিই তা চেয়ে থাকে?

তাদের এক শীর্ষ দাঈ বলেন, "আমি শাইখ তাকিউদ্দিন নাবহানীর[৭২] কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এই প্রস্তাব রাখি, হিযবুত তাহরীরের পাঠচক্রগুলোর সিলেবাসে যেন কুরআনুল কারীম রাখা হয়! তখন তিনি বলেন, 'শোনো, তুমি হিযবুত তাহরীরে আমার যুবকগুলোকে নষ্ট করতে বলো না। আমি দরবেশদেরকে রাখতে চাই না..."

আল্লাহর কিতাবের হাফেজকে যদি অবুঝ দরবেশ মনে করা হয়, রবের কিতাবের শিক্ষা লাভকারীকে যদি নির্বোধ মনে করা হয়, তবে প্রকৃত অর্থে আপনাদের দৃষ্টিতে আলেম কে? আপনাদের কথিত রাষ্ট্রের দায়িত্বভার কাদের কাঁধে অর্পণ করতে চান? আপনাদের কি জানা নেই, সকল প্রকার 'ইলম ও জ্ঞান এই কিতাবুল কারীমের ভেতর নিহিত রয়েছে? সামনে পেছনে কোনো দিক থেকেই যাকে কোনো বাতিল স্পর্শ করতে পারে না? যা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ? আপনাদের কর্ণকুহরে কি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পৌঁছায়নি?

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿الأنعام: ٣٨﴾

'আমি এই কিতাবে কোন প্রকার আলোচনা ছেড়ে দিইনি। অতঃপর, তাদের রবের কাছেই তারা সমবেত হবে'। [৭৩]

এই উদ্ভ্রান্ত পথচলার অভিযোগ আমরা আল্লাহর কাছেই দায়ের করি।

উস্তাদ মওদুদীকে আল্লাহ রহম করুন! তিনি তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'তোমরা তাদের সঙ্গে তর্কে যেও না। তাদেরকে এমন দিনের জন্য ছেড়ে দাও, যেদিন তারা থাকবে না।'

---

[৭২] হিযবুত তাহরীরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
[৭৩] সূরা আল- আন'আম, ০৬: ৩৮

এই সংগঠনের ব্যাপারে আলোচনা কী দিয়ে শেষ করব আমরা বুঝতে পারছি না। ওস্তাদ শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ্'র সেই উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যা তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নাবহানীর সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন, ‘তাদেরকে ছেড়ে দাও। যেহেতু ইখওয়ানের সূচনা ঘটেছে, তাই অচিরেই তারা আর থাকবে না।’

সাহওয়া সালাফী আন্দোলন

গত শতাব্দীর শেষ দিকে এই ধারার সক্রিয়তা জোরদারভাবে প্রকাশ পায়। অল্প সময়ের ভেতর এদের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। জিহাদ এবং মুজাহিদদের সাহায্যের পথে বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়েই তাদের কার্যক্রম চলতে থাকে।

এই ধারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য একটি মানহাজ ও শান্তিপূর্ণ পন্থা উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান চালু, প্রচার মাধ্যম তৈরি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধীরে ধীরে নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তাদের নিকট তুলে ধরা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই একটি বিপ্লব সৃষ্টি করা এই মানহাজের মূলকথা।

হারামাইনের ভূমিতে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের দৃষ্টিতে তা একটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করছে। আবার বিশ্ব মুসলিমের ক্বিবলা এই ভূমিতেই। তাই এই বৈশ্বিক আন্দোলনের প্রবক্তারা[৭৪]—এই আন্দোলনের উৎপত্তিস্থল আরব উপদ্বীপ হোক কিংবা সুবিস্তৃত মুসলিম বিশ্বের যে জায়গাতেই হোক—সর্বোচ্চ নেতা ও পরিচালক বলে বিবেচিত হয়েছেন।

সাহওয়া সালাফী ধারার মানহাজ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে আমরা চাই তাদের অতি ন্যাক্কারজনক বিভ্রান্তির কয়েকটি তুলে ধরতে । এগুলো প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের কাছেই বিভ্রান্তি হিসেবে সুস্পষ্ট। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিদগ্ধ মহলের কথা তো বলাই বাহুল্য। আর এ কাজটি করার উদ্দেশ্য হলো পাঠকের কাছে যেন এই সংশোধনমূলক আন্দোলনের প্রকৃত বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই পরাজিত আন্দোলনের বিভ্রান্তিগুলো সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকার কতিপয় বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ‘আমরা কোন ভিত্তিতে

---

[৭৪] যাদের শীর্ষে রয়েছেন ডক্টর সাফার আল হাওয়ালী, ডক্টর সালমান আল 'আওদা।

লড়াই করি' (علي اي اساس نقاتل؟) শিরোনামের একটি নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের কর্ণধারদের স্বাক্ষরিত উত্তরপত্রের মধ্য দিয়ে। শাইখ নাসির আল ফাহাদ (আল্লাহ তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন!) সমঝোতা, সহাবস্থান ও আপসকামিতামূলক অবমাননাকর এই উত্তরপত্রের ঘৃণিত দিকগুলো নিয়ে মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট উপকারী আলোচনা করে গেছেন। তবুও আমরা প্রাসঙ্গিক সংযোজন হিসেবে ঐ উত্তরপত্রের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই, যাতে অযৌক্তিক এই আন্দোলনের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রথম বিষয়:

অভিন্ন অনুভব-অনুভূতি, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দ্বীন ও মিল্লাতের (ধর্ম ও জাতি) শত্রুদের সাথে অংশগ্রহণ। শত্রুদের পাপ-পঙ্কিল রাষ্ট্রে যে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে, তাতে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ[৭৫]। তাওহীবাদী উম্মাহকে এই ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট করে চিত্রায়ন। অথচ এই বরকতময় কর্মযজ্ঞ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা উলট-পালট করে দিয়েছে।

সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা ডক্টর সফর আল হাওয়ালী এবং ডক্টর সালমান আল 'আওদাহ স্বাক্ষরিত সে উত্তরপত্রের কয়েকটি লাইন লক্ষ্য করুন:

“মুসলিম বিশ্বে এবং এর বাইরে অনেকের কাছেই সেপ্টেম্বরের আক্রমণগুলো মোটেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। মূলনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ, কল্যাণ এবং নীতি ও নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিবিধ কারণে—যা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে— এই ঘটনার হোতাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাইনি।”

স্বাক্ষরকারীরা আরো জানান-পশ্চিমা বিশ্ব যদি ৯/১১-এর ঘটনাকে পাশ্চাত্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে, তবে এটাও অসম্ভব নয় যে, তাদের এমন অনুভূতির সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করব। এমনকি বৈশ্বিক নিরাপত্তার এই হুমকি মোকাবেলায় তাদের সাথে সহাবস্থান করব...।”

[৭৫] এখানে ৯/১১ এর বরকতময় হামলার ব্যাপারে বলা হচ্ছে। -সম্পাদক

দ্বিতীয় বিষয়:

মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, তাঁদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তাঁদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ও তাঁদের দুর্নাম রটনা। অপরদিকে, ক্রুসেডার মার্কিনিদের প্রতি সংহতি, সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা, তাদের সাথে শান্তি চুক্তি ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিত্তিতে ইসলামের শত্রুদের কাতারে যোগদান, মুজাহিদদেরকে বর্বর, অপরাধী, অত্যাচারী রূপে চিত্রিত করা, এমনটা বলা যে, মুজাহিদদের মাঝে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বলে কিছুই নেই; মুজাহিদদের শক্তি নিঃশেষ করা ও তাঁদেরকে সমূলে বিনাশ করার কোন বিকল্প নেই...।

আল্লাহর কসম! উপরোক্ত বিষয়গুলো দ্বীন ইসলামের আল-ওয়ালা ওয়াল বারা-'র মত সুদৃঢ় স্তম্ভে আঘাত করেছে। এবং কুফর বিত তাগুত তথা তাগুতকে সর্বতোভাবে অস্বীকার ও সম্পূর্ণভাবে তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুমহান আকীদার স্পষ্ট বিরোধিতা। এরসঙ্গে আরও রয়েছে পূণ্যভূমি ফিলিস্তিনে ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরোক্ষ স্বীকারোক্তি।

উত্তরপত্রে স্বাক্ষরকারীরা বলে, "উদ্দেশ্য যদি হয় সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎপাটন করা, তবে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা নয় বরং ন্যায় সঙ্গত শান্তি আলোচনাই এর উপযুক্ত পন্থা। ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনের বাইরে এ পন্থার কথাই চিন্তা করছে সারা বিশ্ব। বর্তমানে পারিভাষিক যে অর্থে সন্ত্রাসবাদ প্রচলিত, তা প্রাণ ও সম্পদের ওপর অন্যায় আক্রমণের একটি প্রকার মাত্র। নিঃসন্দেহে এটা নৈতিক অবিচার হবে যে, এই অন্যায় আক্রমণের একটি প্রকার নিয়ে কথা বলা হবে, আর তার অন্যান্য প্রকার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা হবে।"

উত্তরপত্রে আরো আছে- "বিশেষ অপরাধগুলোর দায়ভার অপরাধীদের একান্তই নিজস্ব। তাই, কখনো কেউ অন্যের অপরাধের দায়ভার নেবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿فاطر: ١٨﴾

‘কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না’।[৭৬]

আমরা এ প্রত্যয় ব্যক্ত করতে পারি যে, চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ মহল এমন গভীর ও সুদূরপ্রসারি দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, যা তাদেরকে কতিপয় লোকের স্বেচ্ছাচারিতার পেছনে চলার অনুমতি দেয় না। অথবা বাস্তবতার চাপ সহ্য করতে না পেরে এমন কোনো সহজ সমাধানের কথা চিন্তা করার বৈধতা দেয় না, যার মধ্যে নৈতিকতা ও মানবাধিকারের কোনো বালাই নেই। কখনো কখনো সামাজিক অবস্থা ব্যক্তিকে উদ্বেগ, অস্থিরতা, বঞ্চনা ও অমানবিক লড়াইয়ের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে। মানুষ যখন স্থিতি খুঁজে না পায়, অস্থিরতা, কঠোরতা ও কাঠিন্যের পথে দীর্ঘ যাত্রায় যখন তারা ভেঙে পড়ে, তখনই তাদের মাথায় অনৈতিক কার্যকলাপের চিন্তা আসতে থাকে”।

স্বাক্ষরকারীরা আরো বলেন, “আমাদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা সারাবিশ্বের জন্য একটা বড় সমস্যা। তবে এর প্রতিকারের উপযুক্ত বহুবিধ ব্যবস্থা আছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। সন্ত্রাস চাই মুসলিমদের পক্ষ থেকে হোক কিংবা অমুসলিমদের পক্ষ থেকে—তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য দানে আমরা বরাবরই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ...।”

আমি সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য আমাদের আহ্বান- 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! সময় ফুরোবার আগেই হেদায়েতের পথে ফিরে আসুন! মুজাহিদদের চরিত্রে কালিমা লেপন করা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে সংযত করুন! যে পথে আপনারা চলছেন তা কখনোই কল্যাণ বয়ে আনবে না। নিঃসন্দেহে আপনাদের এই পথচলা আগাগোড়া বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভ্রান্তি বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আপনারা মুজাহিদদের অপবাদ দিচ্ছেন। বিষয়টা আপনাদের অজানা নয়। ইবনে হাজম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “কুফরের পর ওই ব্যক্তির গুনাহের চেয়ে জঘন্য কোনো গুনাহ নেই, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বারণ করে। এবং মুসলিমদের পবিত্র ভূমি তাদের কাছে হস্তান্তর করার কথা বলে।”

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে আমরা সেসব আত্মশুদ্ধি প্রত্যাশী দলকে আহ্বান করছি, যারা এ জাতীয় ইসলাহী মুরব্বিদেরকে নিজেদের নেতা ও আদর্শ

---

[৭৬] সূরা ফাতির; ৩৫: ১৮

বলে ধরে নিয়েছে। আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যে অবিবেচনাপ্রসূত বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন, তা থেকে ফিরে আসুন। আপনারা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র নিম্নোক্ত উক্তিটি নিয়ে চিন্তা করুন, কারণ তাতে দ্বীনের মূলভিত্তি ও মুক্তির পথ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন,

"হে আমার ভাইয়েরা! অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন। আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূল ভিত্তি, প্রথম ও শেষ কথা, প্রধান ও চূড়ান্ত বিষয়—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে আঁকড়ে ধরুন। এর মর্ম অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। এই কালিমাকে এবং এই কালিমার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে ভালোবাসুন। তাদেরকে ভাই মনে করুন, যদিও তারা দূরের কেউ হয়। অপরদিকে, তাগুতকে সর্বাত্মকভাবে অস্বীকার করুন। প্রত্যাখ্যান করুন। বর্জন করুন। তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করুন। তাগুতকে ঘৃণা করুন। যারা তাগুতকে ভালোবাসবে, তাগুতের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করবে, তাগুতকে সর্বোতভাবে বর্জন না করবে, আপনারা তাদেরকেও ঘৃণা করুন। যারা বলবে, তাগুতের প্রশ্নে আমি নিরপেক্ষ, আল্লাহ তা'আলা তাগুতদের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেননি, এমন মতের প্রবক্তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাচার করছে। আল্লাহকে অপবাদ দিচ্ছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের অবকাশ রাখেননি। আল্লাহ তা'আলা তাগুতের প্রতি কুফরি করাকে, তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে ফরজ করেছেন, যদিও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থাকুক কিংবা পিতৃত্বের। তাই অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করুন! আর উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলুন। কারণ, এতে আপনারা এমন অবস্থায় নিজেদের রবের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবেন যে, ইতি পূর্বে তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করেননি। হে আল্লাহ! আপনি ইসলামের ওপর আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে আমাদেরকে মিলিত করুন"!

সাহওয়া সালাফী আন্দোলন ও তার বৈপ্লবিক কর্মপন্থা

বিপ্লব সাধনে সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের পদ্ধতি, তাদের কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে, শান্তিপূর্ণ ও পরাজিত এই মানহাজের ভঙ্গুরতা সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ফরজ বিধান জিহাদের বিকল্প হিসেবে এই মানহাজের কর্ণধারগণ এই মানহাজ উদ্ভাবন করেছেন। অথচ জিহাদকে বিধিবদ্ধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। ফরজ এই বিধানকে আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের একটি উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। জিহাদকে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]

'আর তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ ফিতনা নির্মূল না হয় এবং শাসন ও কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হয়'।[৭৭]

ফরজ বিধান জিহাদের শূন্যস্থান পূরণে বিকল্প হিসেবে তৈরি এই সাহওয়া সালাফী মানহাজের কর্মসূচির কয়েকটি নিম্নরূপ:

প্রথমত:

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সমাজের সমর্থন ও আনুকূল্যের কারণে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবামূলক কাজ করা।

দ্বিতীয়ত:

---

[৭৭] সূরা আল-আনফাল; ০৮ : ৩৯

নিজেদের সংশোধনমূলক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার বিস্তার ঘটাতে এবং জনমত তৈরীর লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যম চালু করা।

তৃতীয়ত:

শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও উত্তম নাসিহা'র মাধ্যমে বিপ্লব সূচিত করার লক্ষ্যে এ সমস্ত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করা।

চতুর্থত:

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশের জন্য সাধারণ সভা ও সম্মেলনের আয়োজন করা।

এমনই আরো বিভিন্ন অসম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাঝে তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখে দ্বীন ইসলামের মহান দায়িত্ব পালনের আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে। একইসঙ্গে ফরজ জিহাদ ও এর বিধানাবলীকে অকার্যকর এবং এর রূপরেখাকে বিকৃত করে দেয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

আকীদাহ ও দ্বীন ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হে আমার ভাই! এই মানহাজের অসারতার প্রমাণ আপনাকে জানতে হবে। এ মানহাজ যে নবী-রাসূলদের মানহাজের এবং আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মাবলীর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক—তার কয়েকটি প্রমাণ আমরা নিম্নে তুলে ধরছি-

১. সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের অনুসারী ও এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীরা তাগুতি শাসন ব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করা, তাগুতদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করা, তাদের ইবাদাত-উপাসনায় অংশ নেয়া, তাদের ছত্রছায়ায় বেঁচে থাকা এবং তাগুতি প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত। নব-উদ্ভাবিত এই মতবাদ কোনো সংশয় ব্যতিরেকে অতি সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরোক্ত বিষয়াবলী আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'-র

মত দ্বীন ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীর লঙ্ঘনের নামান্তর। এবং 'কুফর বিত তাগুত'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদবাদী উম্মাহর আকীদার পুরোপুরি খেলাপ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٥٦﴾

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতের প্রতি কুফরী করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শোনেন এবং জানেন।[৭৮]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, "তাগুতের প্রতি কুফরি করার অর্থ হলো- আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুর ব্যাপারে[৭৯] আকীদাহ্ রাখা হয়, এমন প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। মানব-দানব, প্রস্তর-বৃক্ষ যাই হোক না কেন—এমন জিনিসের ব্যাপারে কুফুরী ও ভ্রষ্টতার সাক্ষ্য প্রদান করা, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; চাই তাদের পরস্পরের মাঝে পিতৃত্বের সম্পর্ক থাকুক কিংবা ভ্রাতৃত্বের।

এখন কথা হলো, কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদাত করব না। তবে আমি কবরপূজারী ও গম্বুজাকৃতি কবরের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকব। এমন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাগুতলে প্রত্যাখ্যান করেনি।"

২. সাহওয়া সালাফী মতবাদ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মতো ফরজ বিধানকে অকার্যকর করে দেয়ার ঘোষণা দেয়। এবং প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজে আইন এই বিধানকে শান্তিপূর্ণ 'জিহাদ' দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়ার কথা

---

[৭৮] সূরা বাকারা;২: ২৫৬

[৭৯] তাগুত হল এমন যে কোন কিছু যা আল্লাহর পরিবর্তে বা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে উপাসিত হয়, এবং সে তাতে সন্তুষ্ট হয়। যে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন ও তাওহিদ ব্যাতীত অন্য কিছুর দিকে আহ্বান করে, সেও তাগুত- সম্পাদক

বলে। শান্তিপূর্ণ জিহাদের উদাহরণ হিসেবে আমরা কল্যাণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করা, দাওয়াতি প্রচারমাধ্যম চালু করা এবং শুধু এগুলোর ভেতরেই কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি ধরে নিতে পারি অনায়াসেই। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের এই পন্থা ফরজে আইন বিধান জিহাদকে পুরোপুরি রহিত করে দেয়ার নামান্তর। অথচ, বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন ,সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর আইন অনুপস্থিত। মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী আমাদের ঘাড়ে চেপে বসছে। ক্রুসেডাররা আমাদের ভূমিগুলোতে আগ্রাসন চালাচ্ছে। সংকটাপন্ন এই অবস্থায় জিহাদ আমাদের জন্য ওয়াজিব।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “কোনো গোষ্ঠী যদি ফরয সালাত, সিয়াম ও হজ পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এবং অন্যের প্রাণ ও সম্পদ, মদ এবং যিনাকে হারাম হিসেবে আমলে নিতে অস্বীকার করে। সেই সাথে মাহরাম মহিলাদের বিবাহ করা হারাম মেনে না নেয় কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা ও আহলে কিতাবদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করা অস্বীকার করে। এবং দ্বীন ইসলামের অবশ্য পালনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, যেগুলো অস্বীকার ও পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে কোনো অপারগতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেগুলো শরীয়তে বিধিবদ্ধ হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফের বলে গণ্য করা হয়—কেউ যদি এসব যথাযথভাবে আমলে না নেয়, তবে এমন দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে যদিও সে দল এসব বিধানকে শরীয়তের বিধান হিসেবে স্বীকার করে নেয়।”

হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ, হাকিম থেকে বর্ণনা করে বলেন, “শাসক, কুফরীর কারণে সর্বসম্মতিক্রমে পদচ্যুত হয়ে যাবে। অতএব, তাকে অপসারণ করতে যে ব্যক্তি সক্ষম হবে, সে সওয়াব লাভ করবে। আর যে তার চাটুকারিতা করবে, তার গুনাহ হবে। আর যে অক্ষম হবে, তার জন্য জরুরী হল ওই ভূমি থেকে হিজরত করা।”

৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কুরআনুল কারীমের বহু জায়গায় মু’মিনদেরকে বিপ্লবের পন্থা বলে দিয়েছেন এবং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত সে পন্থায় চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٩٣﴾

'তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না (যমীনে) ফিতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন ব্যবস্থা (পূর্ণাঙ্গভাবে) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (তবে) যালেমদের ওপর (এটা প্রযোজ্য নয়)'।[৮০]

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿التوبة: ١٢﴾

'অতএব, তোমরা কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।নিশ্চয়ই তাদের সাথে কোনো চুক্তি নেই। আশা করা যায় তারা তাদের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে'।[৮১]

অতএব, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে একমাত্র তাদের রবের ইবাদাতের পথে নিয়ে আসার জন্য কার্যকরী পন্থা হল লড়াই করা। বিধান রচনার একক অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। যারা এতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, সে অধিকারকে নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করে, সেসব মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার তাগুত গোষ্ঠীকে পরাজিত করার মাধ্যম হলো এই লড়াই। সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের লোকেরা দাবি করে যে, কেবল কল্যাণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের ভেতর সামাজিক এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করার মধ্যে নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখাই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট। তাদের এমন ধারণা পুরোপুরি ভুল।

---

[৮০] সূরা আল-বাকারাহ; ০২: ১৯৩
[৮১] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ১২

ইবনে দাকিক আল-ঈদ বলেন, "যুক্তিবা কিয়াসের দাবি হলো, উপকরণের দিক থেকে জিহাদ সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল। কারণ জিহাদ আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের এবং কুফরি নির্মূলকরণ ও অপসারণের মাধ্যম।"

৪. যুগে যুগে দাওয়াতের কাণ্ডারি, সমাজ প্রতিষ্ঠাতা ও জাতি সংস্কারকদের পথ পুষ্প শোভিত ছিল না। তাঁদের পথ মেশক আর আতরের ঘ্রাণে সুবাসিত ছিল না। তাঁদের পথ ছিল রক্ত পিচ্ছিল। তা ছিল খুন রাঙ্গা পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে আমাকে যতটা কষ্ট দেয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।"

নবীজি ﷺ যখন প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হন তখন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল নবীজিকে বলেছেন, "এ পর্যন্ত যারাই আপনার ন্যায় পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তাঁরাই শত্রুতার শিকার হয়েছেন।"[৮২]

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম, বিপদের মুখোমুখি হওয়া, শাস্তির সম্মুখীন হওয়া এবং শত্রুতার শিকার হওয়া এগুলো ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত ব্যক্তির নিষ্ঠা ও ইখলাস অনুপাতে হয়ে থাকে।

যারা শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের পথে এবং সংগঠন গড়ে তোলার মসৃণ পন্থায় সমাজ পরিবর্তন ও জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেন, আমার মনে হয়, অতি সহজীকরণ ও আরাম-আয়েশের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা থেকে তারা এমনটা করেন। সেই সাথে বিপদ-আপদ ও কষ্ট মুজাহাদা এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা থেকেও তারা এমনটি করে থাকেন। আর এটাই হচ্ছে সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের মূল কথা। বস্তুত, তারা এখনো এই দ্বীনের চাহিদা এবং নবীদের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহ বুঝতে পারেননি। তাই, আজও তারা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি।

৫. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংশোধনের আহ্বান ছিল না। বর্তমান সাহওয়া সালাফীদের মতো জাহেলী সমাজব্যবস্থাকে অভ্যন্তরীণভাবে সংশোধন করার মাঝেই তিনি নিজ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেননি। নবীজির দাওয়াত ছিল জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত এক

---

[৮২] সহীহ বুখারী

বৈপ্লবিক আহ্বান। তাতে ছিল মুশরিক ও শিরকের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা। আল্লাহ ভিন্ন পূজনীয় অপর সকল বস্তুর ব্যাপারে নমনীয়তা বর্জন ও যুদ্ধের ঘোষণা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন ছিল ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণীর প্রতিফলন—

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿الممتحنة: ٤﴾

‘তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যা কিছুর ইবাদাত করো তার ব্যাপারে আমরা দায়মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সদা প্রতীয়মান; ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান না আনো’। [৮৩]

৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অতীত ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে এভাবে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম সফল হতে পারে না। বিশেষ করে সর্বগ্রাসী তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে।[৮৪] মিশরের আর-রাইয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা এবং ইখওয়ানের কথা আমরা ভুলে যাইনি।

---

[৮৩] সূরা আল- মুমতাহিনা; ৬০: ৪

[৮৪] মুরতাদ তাগুত , ক্রুসেডারদের গোলাম শাসকগোষ্ঠী যেকোনো সময় এসমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারে। মূলত এ সমস্ত কল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে তাগুত ততক্ষণ সমর্থন করে যতক্ষণ তারা সরাসরি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে না, অথবা যতক্ষন তারা শাসকগোষ্ঠীর জন্য হুমকিতে পরিণত হয় না। দীর্ঘসময় ধরে, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পর তাগুত এক রাতের মধ্যেই এসব প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দেবার সক্ষমতা রাখে। শাইখ আবু বাকর নাজী রাহিমাহুল্লাহ একে ‘নখ-দন্ত অপসারণ নীতি’ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

“এধরনের লোকেরা যখনই নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা মোটামুটি একটা অবস্থানে পৌছায়, তাগুত তার বাহিনি নিয়ে আসে আর কোন ঝামেলা আর উচ্চবাচ্য ছাড়াই ১০-১৫ বছরের ফসল কেটে নিয়ে যায়। এটাই যুগ যুগ ধরে তাওয়াগ্বিতের পলিসি – শত্রুর বিষদাত ভেঙ্গে দেয়ার পলিসি। নখদন্ত অপসারণের পলিসি। তারপর এই দলগুলো গভীর অন্ধকার চক্রে ঘুরপাক খেতে শুরু করে, আবারো তারা প্রথম ধাপে ফিরে যায়। আবার শুরু থেকে শুরু করে। আর অনেক সময় সেই সামর্থ্যও তাদের থাকে না।

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদ্ধতির প্রচারকরা যাদেরকে “হঠকারী”, “মাথাগরম” ইত্যাদি বলে, তারা তাগুতের বিরুদ্ধে কিছু করুক আর না করুক, সময় আসলে তাগুত “বিষদাত ভেঙ্গে দেয়া”র পলিসি বাস্তবায়ন করবেই। এজন্য অন্য কোন কারণের দরকার নেই, দরকারমতো অজুহাত তাগুত তৈরি করে নেবে।

এরকম অনেক উদাহরণ বিভিন্ন দেশ আর বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তাগুতের কোন ক্ষতি করা ছাড়াই, তাগুতকে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে দু’বার ভাবতে বাধ্য করা ছাড়াই, অনেক যুবক এসব

পূর্বোক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞানী, চক্ষুষ্মান, সুস্থ বিবেচনাবোধ সম্পন্ন ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি মাত্রই একথা অনুধাবন করতে পারবেন যে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাহওয়া সালাফী মানহাজ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজের বিরোধী। তাদের মানহাজ নববী মানহাজের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এবং নবীজির আনীত সত্যের পরিপন্থী।

পাঠকের এই বিষয়ে আরও অধিক নিশ্চয়তা লাভ করা উচিৎ। সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের বাস্তবতা আরো ভালোভাবে বোঝা উচিৎ। যে মানহাজের দিকে তারা আহ্বান করে তার প্রকৃতি আরো গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিৎ। যে মানহাজ প্রকৃত অর্থে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর, যে মানহাজ দ্বীন ইসলামের শত্রুদের জন্য সুপেয় সুমিষ্ট ঝর্ণার মতো, তার অসারতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে কীভাবে বসে থাকা যেতে পারে? আর সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে তাদের কর্ণধার ও পরিচালকদের নিজেদের মুখে স্বীকার করা কিছু বিষয় উল্লেখ করব। তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। কিন্তু তাদের নিজেদের মুখের কথা থেকে খুব সহজেই পাঠকের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, দ্বীনের কত বুনিয়াদি বিষয় তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ কত মূলনীতি ও অকাট্য বিধিমালার ওপর তারা আঘাত হেনেছে। স্বজাতির বিরুদ্ধে গিয়ে ক্রুসেডার পাশ্চাত্যকে খুশি করার জন্য তাদেরকে কত কিছু করতে হয়েছে!

সংগঠনের মানহাজের বলি হয়েছে। আর কিভাবেই বা এরা তাগুতের কোন ক্ষতি করবে, যখন তারা মহাবিশ্বের সার্বজনীন নিয়ম এবং শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী এর জন্য প্রস্তুতই না? ইসলামী আন্দোলনগুলো এবং এগুলোর সবগুলোকে শাখাকে অকার্যকর করে দিতে প্রতি ১০-১৫ বছর পর পর তাগুত বিষদাত ভাঙ্গার পলিসি বাস্তবায়নে নামে। যাকে ইচ্ছা তাঁকে হত্যা করে, যাকে ইচ্ছা জেলে দেয়, মসজিদ আর মিম্বার থেকে দাওয়াতি ও দাতব্য কাজ বন্ধ করে দেয়। ধীরে ধীরে ইসলামি আন্দোলনের যে শক্তি ও প্রভাব গড়ে উঠেছিল – সেগুলো গুড়িয়ে দেয়, যাতে তার বিরুদ্ধে এই শক্তি ব্যবহার করা না যায়। তাগুত যখন এ পলিসি বাস্তবায়ন করে, এসব আন্দোলনের নেতারা তখন অবস্থা মেনে নেয়, আর এ অবস্থাকে পরীক্ষা নাম দিয়ে পরাজয়ের প্রতি আত্মসমর্পন করে।”

বাংলাদেশে ইখওয়ানের মানহাজের অনুসারী জামাআতে ইসলামের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা ইসলামী ব্যাংক, এবং মালাউন মোদী বিরোধী আন্দোলনের পর অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাযত ইসলামের নেতাকর্মীদের উপর তাগুত সরকারের ধরপাকড় ও মামলাবাজি থেকে ‘নখ-দন্ত অপসারণ’ নীতির উদাহরণ দেখা যায়।
– সম্পাদক

তাদের অন্যতম প্রধান শাইখ ডক্টর সাফার আল হাওয়ালী, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের বরকতময় জিহাদের বীরদেরকে খাটো করে এবং তাঁদের এই মোবারক কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বিবিসির প্রতিনিধিদেরকে বলেন, "যাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তারা এটি ঘটিয়েছে, তাদের আসলে কোনো আদর্শ নেই। পড়াশোনা তাদের কাছে মূল্যহীন। কারো কারো তো পড়াশোনা একেবারেই নেই এবং শরঈ ইলমের সঙ্গে মোটেও সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, এ কাজটি যদি কোনো আদর্শের জায়গা থেকে করা হতো, তবে এতে সকলের অংশগ্রহণ থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং এজাতীয় লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নিজস্ব...!"

ইরাকে জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্য করতে মুসলিমদেরকে অনুৎসাহিত করেছেন তিনি। উক্কায পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের জবাবে তার প্রদত্ত বক্তব্য লক্ষ্য করুন—

প্রশ্নকারী: যুবকেরা ইরাকে যাচ্ছে। অথচ তারা সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। সেখানে তারা জিহাদের নামে এবং ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধের নামে বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে ঢুকে যাচ্ছে। এগুলো কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ডক্টর সাফার: সাধারণভাবেই এসব কাজ শরীয়ত সম্মত নয়। আমাকে যারা এমন প্রশ্ন করে, নিয়মিত আমি তাদেরকে এই উত্তরই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই। এ বিষয়ের ওপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্নকারী: তার মানে আপনি ইরাকে যুবকদের গমনকে জায়েজ মনে করছেন না?

ডক্টর সাফার: কিছুতেই নয়। কত শত লোক যে নিয়মিত এ বিষয় নিয়ে আমার কাছে আসে! কখনো পিতারা পুত্রদেরকে নিয়ে আসে, আবার কখনো পুত্ররা পিতাদেরকে নিয়ে। সবাইকে আমি এমন কাজ করতে বারণ করে দিই।

প্রশ্নকারী: পিতাদেরকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে আপনি কি জোর দিয়ে এই পরামর্শ দিতে চান যে, তাদের সন্তানরা নিখোঁজ হলে, তারা যেন অবশ্যই প্রশাসনকে এ বিষয়ে অবহিত করে?

ডক্টর সাফার: অবশ্যই। আমি মনে করি, এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, অনেক সময় এভাবে তথ্য দেয়া হলে দেশ ত্যাগের আগেই তাদেরকে ধরে ফেলা সম্ভব হয়। আমার বিশ্বাস, পিতাদের জন্য নিজেদেরকে এবং সন্তানদেরকে রক্ষার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে সন্দেহ নেই যে এক্ষেত্রে দ্রুততা বাঞ্ছনীয়।

মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কি ন্যাক্কারজনক প্রয়াস! মুসলিম মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টির কি জঘন্য উপায়! হে আত্মশুদ্ধির স্তম্ভধারীরা, এ জাতীয় লোকদের এমন কর্মকাণ্ডের পর তাদের প্রতি কি কোনো ভক্তি থাকে? এতকিছুর পর তাদের কথাবার্তার প্রতি কি কোনো আগ্রহ থাকে?

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বারণ করা এবং মুসলিমদের পবিত্র ভূমি কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করতে বলার গুনাহ এতটাই জঘন্য যে, কুফরীর পরে এমন গুনাহের চেয়ে জঘন্য কোন গুনাহ নেই"।

পাঠক আরও দেখুন! মুসলিমদের সম্ভ্রম রক্ষায় চেষ্টারত তাওহীদবাদী ভাইদের ব্যাপার উত্থাপন করা হলে উপরোক্ত শাইখ ক্রুসেডারদের নেতা বুশের ঔদ্ধত্য, কঠোরতা আর ধৃষ্টতার জবাবে তাকে কিরূপে শান্তির বার্তা জানিয়েছেন এবং কতটা বিনয় প্রদর্শন করেছেন। শাইখ তার এক ভাষণে ক্রুসেডার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশকে সম্বোধন করে বলেন,

"হে প্রেসিডেন্ট! আমরা আপনার কল্যাণ কামনা করছি। আমরা আপনাকে সীমালংঘন থেকে বিরত থাকা এবং সংযম অবলম্বন করার ব্যাপারে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ধীরে সুস্থে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিন। আমরা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি...!"

তাদের অপর একজন শীর্ষস্থানীয় শাইখ, ডক্টর সালমান আল-আওদাহ মুজাহিদদেরকে হুমকি দেন এবং তাঁদেরকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

কারণ মুজাহিদরা তার দৃষ্টিতে চরমপন্থী এমন একটি চক্র, যাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিমদেরকে হেফাজত করা জরুরি। তিনি বলেন,

"ফিলিস্তিনে ইহুদি আগ্রাসন তাকদীরের লিখন। আর আমরা যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব এটাও তাকদীরের লিখন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা মুসলিমদের মাঝে কুসংস্কারের উপস্থিতি আবিষ্কার করেছি। আর এ সমস্ত কুসংস্কারকে সহীহ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো দ্বারা মূলোচ্ছেদ করা আমাদের জন্য অদৃষ্টের লিখিত দায়িত্ব। আমাদের আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বর্তমানে চরমপন্থা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মত ব্যাপারগুলো ঘটছে। আর তাই এক্ষেত্রেও আমাদের জন্য তাকদীরের লিখিত দায়িত্ব হচ্ছে, নেতিবাচক এসব দিক ও বিষয়ের মোকাবেলা করা, এগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।"

ডক্টর সাহেব! আপনি কাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছেন! যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরব উপত্যকায় মুসলিমদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে জিহাদরত, তাঁদের বিরুদ্ধে? যারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এবং হিংসুটে রাফেজী ইবনে আল-কামীর উত্তরসূরীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত তাঁদের বিরুদ্ধে? আপনার কি জানা নেই, ক্রুসেডারদের আগ্রাসন ইরাকবাসীর বুক ছিন্নভিন্ন করে দেবার পর আপনাদের ক্ষতি করার জন্য ধেয়ে আসত? কিন্তু তা হয় নি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া-অনুগ্রহে আপনাদেরকে সেই অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। তাই তো তিনি ইরাক আগ্রাসনের মুখে আবু মুসআব জারকাবি রাহিমাহুল্লাহ'র মত ব্যক্তিত্বদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এ আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করেছেন। আপনাদের ভূখণ্ডের[৮৫] দিকে ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রাকে তাঁরা রুখে দিয়েছেন।

অন্য এক বক্তব্যে তিনি মুজাহিদদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। এবং ৯/১১ এর বরকতময় জিহাদের বীর সেনানীদেরকে 'উত্তম চরিত্র বঞ্চিত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত' আখ্যা দেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই অল্প কিছু মানুষ যাদের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সক্ষমতা নেই, তারা তখনই কারো ক্ষতি করতে অগ্রসর হতে পারে, যখন তাদের মাঝে মৌলিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বলে কিছুই থাকে না।"

[৮৫] এখানে বিলাদুল হারামাইনের কথা বলা হচ্ছে। -সম্পাদক

আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, মিশরে সাহওয়া সালাফী ধারার মুরুব্বী জামাল সুলতানের বক্তব্য। তিনি মুজাহিদদেরকে নির্মূল করার জন্য তাগুত সরকারকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ কাজের সবচেয়ে উত্তম পন্থা তাদেরকে বাতলে দিয়েছেন। ইসলাহী এই নেতা বলেন, "নিশ্চয়ই কট্টরপন্থী ইসলামী দলগুলো একটি বিশেষ পন্থায় সহিংসতাকে নিজেদের মানহাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের এই পন্থা একটি স্বতন্ত্র মৌলভিত্তির অধীনে রচিত। এ সমস্ত দলের মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হলো, হেকমত এবং কঠোরতা, মানবিক ও সামাজিক জ্ঞান,নিরাপত্তা ও গুপ্তচরবৃত্তির পারদর্শিতা, চিন্তা পরিশুদ্ধি কার্যক্রম ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। সেইসাথে শক্তি প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ—উপরোক্ত প্রতিটি বিপরীতমুখী বিষয়ের সমন্বিত প্রয়োগ।"

সাহওয়া সালাফী ধারার উস্তাদ জায়েদ ইব্রাহীম মুহাম্মাদ[৮৬] সংশোধনমূলক শান্তিপূর্ণ দাওয়াতি চিন্তাধারার ওপর জিহাদী ধ্যান ধারণার প্রাধান্য বিস্তারে ভীত হয়ে এই বক্তব্য প্রদান করেন, "আমাদের এই প্রতিষ্ঠান একটি সাংস্কৃতিক ও দাওয়াতি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কথা -শান্তিপূর্ণ প্রকাশ্য দাওয়াতি মিশন। ইসলামের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে এবং দাওয়াত প্রচারে আমরা কারো সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াই না। দুঃখজনক বিষয় হলো, এ বিষয়টা নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। আমরা কখনোই কামনা করি না, অনুচিত এই চাপ প্রয়োগের কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ যারা মধ্যমপন্থী ও মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণকারী হিসেবে সুপরিচিত, - আল্লাহ না করুন- তারা কট্টরপন্থী চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হোক এবং বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় গ্রহণ করুক'!

সাহওয়া সালাফী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদেরকে আমরা সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ'র সেই বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যা তিনি তাঁর অনবদ্য তাফসীরগ্রন্থ 'যিলালিল কুরআনে' লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা আশা করব, তাদের মাঝে কেউ উৎকর্ণ হয়ে এ বিষয়টি শ্রবণ করবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। সাইয়্যেদ কুতুব লিখেন, "মুসলিম উম্মাহর জাতীয় জীবনে জিহাদ যদি আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতো, তবে এতটা গুরুত্ববহ আঙ্গিকে আল্লাহর কিতাবের এত বিরাট অংশ তা দখল করে থাকত না।

---

[৮৬] জর্ডানের কুরআন সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের পরিচালক

হাদীসের এতগুলো অধ্যায়ে এতটা তাৎপর্যমণ্ডিত রূপে তার উপস্থিতি থাকত না। জিহাদ যদি মুসলিমদের জাতীয় জীবনের আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোনো অনুষঙ্গ হত, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি মুসলিমকে শামিল করে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য এমন উক্তি করতেন না— 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, কখনো সে যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের ব্যাপারে মনে মনে সংকল্প করেনি, সে মুনাফেকির একটি অঙ্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল।'

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন, রাজা বাদশারা এবং শাসকবর্গ জিহাদকে অপছন্দ করবে। তিনি এটিও জানেন যে, শাসন ক্ষমতার অধিকারীরা জিহাদের বিরোধিতা করবেই। কারণ এটি তাদের স্বার্থের বিরোধী। তাদের মানহাজের খেলাপ। শুধু অতীতেই নয়, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও এমন বিরোধিতা আসবেই। প্রতিটি ভূখণ্ডে প্রতিটি প্রজন্মে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন, অকল্যাণের সদম্ভ পথ চলা অব্যাহত থাকবেই। অকল্যাণ কারো জন্য দয়া দেখাবে না। কল্যাণ যতই নমনীয়তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পথ চলুক না কেন তার অগ্রগতির পথে অকল্যাণ বাধা সৃষ্টি করবে না—এটি কখনোই হবার নয়। মিথ্যা নিজেকে রক্ষার জন্য অনিবার্যভাবেই শক্তি প্রয়োগ করে, সত্যের কণ্ঠরোধ করে, তাকে হত্যা করতে চাইবে। বিশ্ব প্রকৃতির এটি একটি অমোঘ বাস্তবতা। এটি সাময়িক কোনো ঘটনা নয়। এটি স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম, আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোনো ব্যাপার নয়। আর এ কারণেই জিহাদ। যেকোনো অবস্থাতেই একে প্রয়োজন।

আবশ্যিকভাবে প্রথমে মনোজগতে জিহাদের অবতারণা হয়। অতঃপর সেটি বাস্তবতায় রূপ নেয়। তখন অনিবার্যভাবেই 'সশস্ত্র অকল্যাণ' আর 'সশস্ত্র কল্যাণ' মুখোমুখি হয়। সংখ্যার বলে গর্বিত বাতিল শক্তি যখন হকের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তখন হকও থাকে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন। এর অন্যথা হলে এবং হক সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন না করলে ব্যাপারটা হয়ে যায় আত্মঘাতী। তা এমন এক প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়, যা মু'মিনদের জন্য সমীচীন নয়। তাই জান ও মাল ব্যয় করার কোনো বিকল্প নেই। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের কাছ থেকে তলব করেছেন এবং জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এখন সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁদের ভাগ্যে বিজয় থাকতে পারে, আবার তার বদলে

শাহাদাত থাকতে পারে। তাকদীর ও ভাগ্যের এই লিখন সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন, যার সর্বত্র রয়েছে তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞার প্রলেপ। মু'মিন বান্দাদের জন্য তাঁদের রবের কাছে দুই কল্যাণের কোনো এক কল্যাণ অবশ্যই নির্ধারিত রয়েছে। আর সাধারণভাবে সকল মানুষ নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে মৃত্যুবরণ করবে। কেবল শহীদরাই এমন সৌভাগ্যবান যারা শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হন। যেন তারা চির অমর।"

আমরা এখানেই সাহওয়া সালাফী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার ইতি টানতে যাচ্ছি। আমাদের এই অধ্যায় ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সে সমস্ত ইসলামী দলের বিবরণ নিয়ে রচিত, যেগুলো আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিপ্লব কায়েমে নির্দিষ্ট কিছু পন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। আল্লাহর তৌফিক ও অনুগ্রহে আমরা সেসব মানহাজের বক্রতা, সত্য-বিরুদ্ধতা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ও খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠায় নববী আদর্শের সঙ্গে এ সমস্ত মানহাজের সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদু লিল্লাহ!

ইসলামী আন্দোলনগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত এই অধ্যায়টি ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করতে চাই, যা 'মাদারিজুস সালেকীন' গ্রন্থে রয়েছে। আশা করছি, এর দ্বারা কল্যাণ প্রত্যাশী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ দান করবেন! সত্য সঠিক পথে চলতে আগ্রহী ব্যক্তিকে তিনি সঠিক পথের দিশা দান করবেন! একমাত্র আল্লাহই সরল সঠিক পথের দিশা দানকারী।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্বীন ইসলাম তাঁদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল এবং তাঁদের বুকের এতটা গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছিল যে, তাঁরা এর ওপর অন্য কোনো প্রকার রায়, যুক্তি, অন্য কারো অনুসরণ অথবা কোনো প্রকার মানবিক বিচার বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে রাজি ছিলেন না। ফলে, পুরো পৃথিবীজুড়ে তাদের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর পরবর্তীদের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের স্তুতির চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথ চলেছিল তাঁদের অনুসারীদের প্রথম প্রজন্ম।

তাঁদের এ সমস্ত তৌফিকপ্রাপ্ত অনুসারীবৃন্দ তাঁদের পথ ও পন্থা অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন দলপ্রীতি ও ব্যক্তিপূজা থেকে যোজন যোজন দূরে। তাঁরা ছিলেন সদাসর্বদা দলীল ও হুজ্জতের পক্ষে। ছিলেন সত্যের ধারক বাহক – সে সত্য তাঁদেরকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন। তাঁরা ছিলেন সত্য পথের নির্ভীক পথচারী যেখানেই সত্যের তাঁবু স্থাপিত হোক না কেন। যখন দলীল-প্রমাণ তাঁদের সামনে স্পষ্ট হতো, তখন তাঁরা সবান্ধবে নির্বান্ধবে সেদিকে ছুটে আসতেন। যখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে কোনো দিকে আহ্বান করতেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে কোনো কিছু করার আদেশ কেন দিলেন, হুকুমের পেছনের হিকমাহ ইত্যাদি খুঁজতে যেতেন না। প্রিয় নবীজির বাক্যমালা তাঁদের অন্তরের গভীরে এবং হৃদয়ের গহীনে বদ্ধমূল ছিল। অন্য কোনো মানুষের কথাকে তার ওপর প্রাধান্য দিতে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কোনো যুক্তি দিয়ে রাসূলুল্লাহ'র ﷺ বক্তব্যকে বিচার করতে তাঁরা মোটেই রাজি ছিলেন না।"

অতঃপর ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "অতঃপর তাঁরা (তাবেয়ীরা) গত হয়ে গেলে নতুন প্রজন্ম এল। তারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। নিজেরাও শতধা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে তুষ্ট থাকল। তারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল। অথচ প্রত্যেকেই তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তারা দলপ্রীতিকে নিজেদের আদর্শে পরিণত করল। দলান্ধতাকেই তারা তাদের ব্যবসার পুঁজি বানাল। তাদের মধ্যে আরেকদল কেবল অন্ধ অনুসরণ করেই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে লাগল। তারা বলতে লাগল, "নিশ্চয়ই আমরা যে আদর্শের ওপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি, তাই আমরা অনুসরণ করে যাব"। উভয় দলই অনুসরণযোগ্য, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ﴿النساء: ١٢٣﴾

'না তোমাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষা।'[৮৭]

---

[৮৭] সূরা আন-নিসা; ০৪: ১২৩

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত স্পষ্ট হবে, তার জন্য অন্য কোনো মানুষের বক্তব্য গ্রহণ করে নবীজির সেই সুন্নাহ পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সকল মুসলিমরা একমত'।

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণে প্রত্যাশী হে ভাই! পূর্বের সকল আলোচনা শেষ করে এখন আমরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পন্থা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই আলোচনায় আমরা পুরোপুরি নির্ভর করব নববী আদর্শের ওপর এবং আল্লাহর অনুমোদিত বিশ্ব প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ওপর। বস্তুত, আল্লাহই তাওফীক দাতা এবং তিনিই একমাত্র সরল সঠিক পথের দিশা দানকারী।

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অবহিত এমন যে কারো কাছে এটা স্বীকৃত যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, খিলাফতে রাশেদা পুনরুদ্ধার এবং মুসলিমদের জন্য ইমাম নিযুক্তি এবিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয়। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলো হলো ফরজ। সক্ষমতা থাকলে কোনো মুসলিম সদস্যের জন্য এই ফরজ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত এমনই।

ইমাম মাওয়ারদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইমামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নবুওয়্যাতের প্রতিনিধিত্ব করা। উম্মাহর মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এ কাজ করা ওয়াজিব।"

ইমাম লাইস রাহিমাহুল্লাহ 'আস সাওয়া'ইক আল মুহরিক্বা' গ্রন্থে বলেন," সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবুওয়্যাত যুগের সমাপ্তির পর ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব। তারা সকলে এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব বলে ধরে নিয়েছিলেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাফন কার্যেরও পূর্বে তা সম্পন্ন করেছিলেন।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জানা আবশ্যক যে, সর্ববিষয়ে মানব সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদান ও দায়িত্বগ্রহণ দ্বীন ইসলামের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের একটি। বরং এভাবে বলা যায় যে, নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না । কারণ, সমাজবদ্ধ না হলে বনী

আদম পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ লাভ করতে পারে না। স্বভাবতই মানুষ একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। আর একটি সমাজের জন্য একজন নেতা আবশ্যক। বিষয়টি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন-

« إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ».

'তিনজন যদি কোনো সফরে বের হয়, তবে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়'।[৮৮]

তিনি ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

'এমন তিন ব্যক্তি যারা কোনো মরুভূমিতে রয়েছে, তাদের কোনো একজনকে আমীর বানানো ব্যতীত তাদের এই অবস্থান হালাল (বৈধ) নয়।'[৮৯]

আমরা দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের মত সাময়িক সহ-অবস্থানের ক্ষেত্রে আমীর নির্ধারণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। আর তার কারণ হলো- আমাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, সব ধরনের মানব সম্মেলনেই এ কাজ আবশ্যক। সমাজবদ্ধতার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় আরও একটি কারণে; আর তা হলো- আল্লাহ তা'আলা আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব করেছেন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ ও নেতৃত্ব ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা যায় না। এমনিভাবে জিহাদ পরিচালনা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হজের ব্যবস্থাপনা, জুমআ ও ঈদের নামাযের অনুষ্ঠান, মজলুমের সহায়তা, হদ বা ইসলামিক দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ শক্তি প্রয়োগ ও নেতৃত্ব ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়।"

শাইখুল ইসলামের বক্তব্যের শেষ দিকে রয়েছে— "অতএব, ওয়াজিব হলো দ্বীন ও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির মাধ্যম মনে করে নেতৃত্ব নির্ধারণ করা। কারণ, এই নেতৃত্ব মূলত: আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যেরই নামান্তর।

---

[৮৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৬১০

[৮৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৬৪৭

ফলে তা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদাতগুলোর অন্যতম এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির একটি বড় মাধ্যম। তবে, এ ক্ষেত্রে কামনাবৃত্তি ও সম্পদ সঞ্চয়ের কারণে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।”

অতএব, এই দ্বীনের জন্য কাজ করা, আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যকরী পন্থায় চেষ্টা করা এবং মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করা, এগুলো প্রত্যেকটি ওয়াজিব বিষয়, যা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজে আইন।

আমাদের ইমামগণ এমনটাই বলেছেন। রাহিমাহুমুল্লাহ। আল্লাহ যাদেরকে অপারগ বলেছেন, তারা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব পালনে ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

হেদায়েতের পথিক হে ভাই আমার! আসুন! মু'মিনদের বিজয় ও তার মধ্য দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার[৯০] সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজপথে আমরা প্রথম কদম ফেলি। বস্তুত: আল্লাহই তৌফিক দাতা এবং একমাত্র তিনিই সরল সঠিক পথের দিশা দানকারী।

---

[৯০] যা গৌরবান্বিত এই উম্মাহর একনিষ্ঠ সদস্যদের কাঁধে অর্পিত এক গুরুদায়িত্ব।

হকপন্থী ইসলামী দলের সারিতে অংশগ্রহণ

সমাজবদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের সার্বিক অবস্থা ও সামগ্রিক জীবন পরিশুদ্ধ হয় না। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ মানুষের জন্য এমনটাই চেয়েছেন ও নির্ধারণ করেছেন। আর কোনো অবস্থায় এমনটা কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, মানুষ নিজে নিজেই সমাজবদ্ধ হবে। সমাজের প্রতিটা সদস্য একে অপরের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে। নিজের সব কাজ নিজেই সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগে মানব সমাজের নানা চিত্র দেখা গেছে। একেক সমাজের জীবনের রূপ ছিল একেক রকম। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক একটি সমাজ। কখনও কখনও সমাজ ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে। কখনো তা ছিল বৃহৎ গ্রামভিত্তিক বসতি। আবার কখনো ছিল যাযাবর গ্রামীণ গোত্রীয় কাঠামোর অধীনে। তবে এত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মাঝেও প্রতিটি সমাজে যে বিষয়টি সর্বদাই বিদ্যমান ছিল, তা হচ্ছে— নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী সম্পন্ন এমন এক ব্যক্তি, যাকে সকলেই মান্য করবে। সর্ব মান্যবর ওই ব্যক্তি এমন হবে যে, সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নেবে। সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং যে নীতি প্রণয়ন করবে, সেসব নির্দেশ তারা শ্রবণ করে চোখ বন্ধ করে তার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

উসমানী খিলাফত ও খলীফাতুল মুসলিমিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের শূন্যস্থান তৈরি হয়। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বিচিত্র ধরনের বহু ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সংগঠনের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল, দুর্যোগ কবলিত জীবন বাস্তবতায় অবিকল খিলাফতে রাশেদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাহকে হারানো সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করা। সেই সিংহাসনে যা প্রাচীন রোমকদের উত্তরসূরী ক্রুসেডাররা দখল করে নিয়েছে। এবং উম্মাহর গৌরবের আসন পুনরুদ্ধারের পথে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী জামাতগুলোর আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলিম সন্তানদের মাঝে সেসব জামাতে যুক্ত হওয়া এবং তাদের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করার হিড়িক পড়ে যায়। কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল যে, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে এমন একটি জামাত প্রয়োজন, মুসলিমরা যার পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যার তত্ত্বাবধানে দ্বীনের কাজ করবে। আর এভাবেই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠাতার প্রথম পর্যায়- মুসলিম সমাজ নির্মাণে সফলতা আসবে।

মুসলিম জামাতের কাতারে শামিল হওয়া ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করা একপ্রকার অলীক স্বপ্ন ও আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন স্বপ্নচারী ব্যক্তি অচিরেই তার একাকীত্ব আবিষ্কার করবে। আর তখন তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তিক্ত বাস্তবতার প্রস্তরাঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যে মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সুবাসিত সুফল লাভের আশায় বহুলোক জীবন ব্যয় করেছে, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সকল শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মর্যাদা বোধসম্পন্ন প্রতিটি মুসলিম মাত্রই এটা জানেন।

আমরা বাস্তবতার নিরিখে এই সত্য জানতে পারলাম যে— মুসলিম জামাতের কাতারে শামিল হওয়া এবং তার তত্ত্বাবধানে কাজ করা ছাড়া কোনো ইসলামি সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তো এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, মুসলিম জামাতের পরিচয় কী? মুসলিমদের জামাতে শামিল হওয়ার আবশ্যকতা কোন দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত? তাইফা আল মানসূরা বা ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত জামাতে সামর্থ্য অনুযায়ী যুক্ত হওয়া এবং তার সদস্য বৃদ্ধি করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। এই জামাতের প্রধান গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ইসলামী অঙ্গনে সক্রিয় দলগুলোর মধ্যে কোনটির মাঝে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়?

মুসলিম জামাতের পরিচয়

পারিভাষিক অর্থে জামাত হচ্ছে দ্বীনের হকপন্থী অনুসারীরা; যারা নবী করীম ﷺ -র আদর্শ ধারণকারী। যদিও তারা মানুষের মাঝে অপরিচিত স্বল্প সংখ্যক লোক হয়, এতেও কোনো অসুবিধা নেই। নবী-রাসূলদের অবস্থা এবং মানুষদের মাঝে তাঁদের একনিষ্ঠ উত্তরসূরীদের অবস্থা এমনই ছিল। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“ঐ সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুন্নাহ'র অবস্থান হচ্ছে সীমালংঘন ও শৈথিল্যের মাঝামাঝিতে। অতএব, তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকো—আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করুন—কারণ অতীতেও আহলে সুন্নাহ ছিলেন মানুষদের মাঝে অতি অল্প। আর ভবিষ্যতেও তাঁরা সংখ্যায় নগণ্যই হবেন। তাঁরা বিলাসিতায় বিলাস প্রিয়দের সঙ্গ দেন না। বিদাতপন্থীদের বিদ‘আতের মাঝে অংশ নেন না। তারা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থেকেই নিজেদের রবের সঙ্গে মিলিত হন। আর আল্লাহ চাহেন তো ভবিষ্যতেও এমনটাই হবে। অতএব, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করো।”

উম্মাহর উলামায়ে কেরাম -আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন - জামাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এবং তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতানৈক্যের সম্মুখীন হয়েছেন।

আমাদের শাইখ আব্দুল হাকিম হাসসান ‘হিদায়াতুল মুজাহিদীন ইলা ওয়াসিয়্যাতিন নাবিয়্যিল আমীন’ নামক তাঁর অনবদ্য গ্রন্থে জামাত সম্পর্কে লিখেছেন,

“কেউ কেউ বলেন, জামাতের উদ্দেশ্য হলো- সত্য পথ ও আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, যদিও একজন ব্যক্তির মাধ্যমেই তা হয়। কারণ, অনুসরণ তো কেবল সত্য পথেরই হওয়া উচিত, অন্য কোনো কিছুর নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জামায়াত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক লোক অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলিমের অংশগ্রহণ। কারণ, আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুরো উম্মতকে কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে দেন না। অপরশ্রেণী বলেন, জামায়াত বলতে বোঝায় মুসলিমদের ওই দল, যারা একজন আমীরের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ। যেখানে

সকলেই আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এতগুলো মতামতের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো- জামাত হচ্ছে হক বা সত্য পন্থা, যদিও তার ওপর মাত্র একজন প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে আল্লাহর প্রশংসা যে, অধিকাংশ সময় মুসলিমদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক লোক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যদি অধিকাংশ মানুষ- যাদের মাঝে থাকবেন উলামায়ে কেরাম- তারা সকলে মিলে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইমামের পতাকাতলে সমবেত হন, তখন তাদেরকে জামাত বলা হবে। তবে এটা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়, বরং তাদের সত্যানুসরণের কারণে। আর যদি অধিকাংশ লোক সত্যের বিরোধিতা করে, তবে তাদেরকে জামাত বলা হবে না। জামাত বলা হবে হকপন্থীদেরকে, যদিও তারা সংখ্যায় স্বল্প হয়। অতীতকালে এবং বর্তমানেও আমরা বহুবার দেখেছি, সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ সত্য ও হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের মাঝে স্বল্প সংখ্যক লোকই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, যারা রাসূল ﷺ-এর ইলম, হেদায়েত ও দ্বীনে হকের পুরোপুরি অনুসারী।”

অতঃপর শাইখ হাফিজাহুল্লাহ নিজ গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তিনি নিজের এই মাযহাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণে অনেক দলীল হাজির করেন। যার মূল কথা হলো: সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং সত্যের সঙ্গে চলার অর্থই জামাত। এটাই বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার পথ এবং এ পথেই মুক্তি।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যা সত্যের অনুকূল তাই জামাত, যদিও তুমি একা হও।” এ বিষয়ে কেউ আরো বেশি জানতে চাইলে উপরোক্ত গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করতে পারেন। তাতে রয়েছে অন্তর শীতলকারী ও হৃদয় প্রশান্তকারী বিস্তারিত আলোচনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের অন্তরসমূহ সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিক। (আমীন)

মুসলিম জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকা এবং আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভাজন পরিহারের আবশ্যকতা

সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ মুসলিমদের একতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়টির মর্যাদা তিনি সমুন্নত করেছেন এবং এটিকে সর্বোচ্চ মানের বিষয় বলে বিবেচিত করেছেন। আর তার কারণ হলো, একতার মাঝে বহুবিধ কল্যাণ ও বিবিধ উপকারিতা নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে, তিনি দ্বীনের অনুসারীদেরকে মতানৈক্যে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। কারণ, বিভেদ-বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দ্বীন ও আকীদাহ সচেতন প্রতিটি তাওহীদবাদী মুসলিমদেরকে সে ক্ষতি স্পর্শ করে।

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীদেরকে জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভাজন তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তাই তো চিরন্তন, শাশ্বত, সুস্পষ্ট সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারীদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করছেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿آل عمران: ١٠٣﴾

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। [৯১]

তিনি আরও ইরশাদ করেন-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿آل عمران: ١٠٥﴾

---

[৯১] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১০৩

'আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব'। [৯২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿الأنفال: ٤٦﴾

'আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রাসূলের। তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [৯৩]

আল্লাহর কিতাবে এমন আরো বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে একতা ও ঐক্যের এবং মতানৈক্য বর্জন ও বিরোধ পরিহারের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। অতএব, এ বিষয়টি মুসলিমদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের একটি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে থাকা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের একটি, যা নিজ কিতাবে আল্লাহর জোরালো ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত। এটি এমন একটি বিষয়, যা পরিত্যাগ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা আহলে-কিতাব ও অন্যান্যদেরকে তীব্র নিন্দা করেছেন। বিশেষভাবে যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোর দিয়ে ওসিয়ত করে গেছেন, ঐক্য ও একতার এই বিষয়টিও সেসবের অন্যতম। যেমন তিনি ﷺ ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ, وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبَعْدُ

---

[৯২] সূরা আলে ইমরান, ০৩: ১০৫
[৯৩] সূরা আল আনফাল, ০৮: ৪৬

“জামাতবদ্ধ থাকা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ জামাতের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। আর একজনের সাথে শয়তান থাকে, কিন্তু দুইজন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। ।” [৯৪]

একইভাবে ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ নিজ তাফসীর গ্রন্থে (وَلَا تَفَرَّقُوا) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, “আল্লাহ তা’আলা মু’মিনদেরকে জামাতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিচ্ছিন্ন হতে বারণ করেছেন।”

ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো- এর দ্বারা আল্লাহ তা’আলা বোঝাতে চাচ্ছেন: 'তোমরা আল্লাহর নির্দেশিত দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো। নিজ গ্রন্থে তিনি কালিমায় হক ও তার প্রতি আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে একতা ও ঐক্যের যে নির্দেশ ঘোষণা করেছেন, তোমরা তা আঁকড়ে থাকো। আর এটিই হল ওই রজ্জু, যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে । এ কারণেই নিরাপত্তাকে রশি বলা হয়েছে। কারণ নিরাপত্তা, ভীতি দূরীভূত হওয়া এবং উদ্বেগ আশঙ্কা থেকে মুক্তিলাভের কারণ হয়ে থাকে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আল্লাহর রজ্জু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জামাত’। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত ও কুরআনের এজাতীয় অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “মহান আল্লাহ মু’মিনদেরকে জামাতবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি মতানৈক্যে লিপ্ত হতে এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হতে বারণ করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে লৌকিকতা এবং আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ঝগড়া বিবাদের কারণে।”

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম— শা'বী সূত্রে এবং তিনি সাবেত ইবনে ফাত্বিনাহ্ আল মাযানী সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, “আমি ইবনে মাসউদকে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ কথা বলতে শুনেছি, হে মানুষ সকল! তোমাদের জন্য আবশ্যক হল আনুগত্য ও জামাতবদ্ধ থাকা। কারণ এই উপায়টি আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত রজ্জু”।

[৯৪] শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং- ১১০৮৫

ইবনে আবি হাতেম— সাম্মাক ইবনে ওয়ালিদ আল হানাফী থেকে বর্ণনা করেন, ‘তিনি ইবনে আব্বাসের সাক্ষাতে মিলিত হন। অতঃপর বলেন, আমাদের শাসকদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী, যারা আমাদের ওপর জুলুম করছে, আমাদেরকে গালিগালাজ করছে এবং আমাদের প্রাপ্য সদাকার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করছে? আমরা কি তাদেরকে বাধা দেবো না? তখন তিনি বলেন, ‘না। তাদেরকে সেগুলো দিয়ে দাও। আর অবশ্যই অবশ্যই জামাতের সংহতি রক্ষা করো। পূর্ববর্তী উম্মতগুলো জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শোনোনি’?

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿آل‌عمران: ١٠٣﴾

‘আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’। [৯৫]

মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের মত দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভক্তি সৃষ্টি না করার আবশ্যকতা ও নির্দেশ সংবলিত মুতাওয়াতির[৯৬] বহু হাদীসে নববী বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((إنَّ اللهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً ، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ)) . رواه مسلم

“আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের তিনটি কাজে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তোমাদের জন্য তাঁর পছন্দনীয় বিষয়গুলো হলো- (১) তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না (২) তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে

[৯৫] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১০৩
[৯৬] যুগ পরম্পরাগত

না (৩) আল্লাহ যাকে তোমাদের নেতৃত্বভার দান করেন তোমরা তাঁর কল্যাণ কামনা করবে। আর তোমাদের যে কাজগুলোতে তিনি রাগান্বিত সেগুলো হচ্ছে- (১) ক্বিল ওয়া ক্বাল (সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু বর্ণনা করা যেমন, 'কথিত আছে যে'; ইত্যাদি ইত্যাদি) (২) অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং (৩) সম্পদের অপব্যয়।” [৯৭]

আমরা দেখতে পেলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কাছে পছন্দনীয় তিনটি বিষয়ের একটি হল, আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববী এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ মুসলিমদের জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকতে এবং পরস্পরে সদ্ভাব সম্প্রীতি বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়টি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম। প্রকাশ থাকে যে, পছন্দনীয় তিনটি বিষয়ের প্রথমটি হলো: শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করা। তৃতীয়টি হলো, সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَماعَةَ

“তোমাদের জন্য আবশ্যক হল জামাতবদ্ধ থাকা। আর অবশ্যই অবশ্যই বিচ্ছিন্নতা পরিহার করতে হবে। কারণ একজনের সাথে শয়তান থাকে কিন্তু দুইজন থেকে সে অধিক দূরত্বে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করতে চায় সে যেন জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকে।” [৯৮]

পাঠক লক্ষ্য করুন! নেকড়ে বাঘ যেভাবে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন বকরীকে নির্জনে নিয়ে যায়, শয়তান ঠিক সেভাবেই একাকী ব্যক্তির ওপর চড়াও হয়ে তাকে নির্জনে নিয়ে যায়। তাকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত করে।

---

[৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৫৭৮

[৯৮] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-২১৬৫

আরও লক্ষ্য করুন! জামাতবদ্ধ থাকাকে শয়তানের বিরোধিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে! আমরা দেখতে পেলাম, শয়তানকে অপ্রস্তুত করার উপায় এবং পদস্খলন ও ধ্বংস থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই একতাকে। জান্নাতের সুপ্রশস্ত প্রাণকেন্দ্র ও তার মধ্যভাগে অবস্থানের জন্য শর্ত করা হয়েছে মুসলিমদের জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকা ও তাদের পতাকার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সর্বপ্রকার বিবাদ, মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করাকে।

তামীম দারী বলেন, “উমার ইবনে খাত্তাবের যুগে মানুষেরা দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে আরম্ভ করেছিল। তখন তিনি বলেন, ‘হে আরববাসী! ভূমি ভূমি! (অর্থাৎ দালানকোঠার প্রতি মনোযোগী না হয়ে ভূমির কাছাকাছি থাকো) নিশ্চয়ই জামাত ছাড়া ইসলামের কোনো মূল্য নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামাতের কোনো মূল্য নেই। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বের কোনো মূল্য নেই। শুনে রাখো! যাকে তার সম্প্রদায় বুঝে-শুনে নেতা বানাবে, তার এই নেতৃত্ব তার নিজের জন্য এবং তাদের সকলের জন্য জীবনীশক্তি হবে। আর যাকে তার সম্প্রদায় না বুঝে-শুনে নেতা বানাবে, তার এই নেতৃত্ব তার নিজের জন্য এবং তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।”

ইমাম আওযা'য়ী বলেন, “বলা হয়, মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবী ও তাবেঈগণ পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন: (১) জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকা, (২) সুন্নাহ অনুসরণ, (৩) মসজিদ নির্মাণ, (৪) তেলাওয়াতে কুরআন এবং (৫) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ”।

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাইফায়ে মানসূরার বা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের প্রধান গুণাবলী ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য

এত এত দল আর সংগঠনের ভিড়ে তাইফা আল মানসূরা চেনা বড় দায়। প্রতিটি দলই নিজেদেরকে হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর বাহিনী বলে দাবি করছে। নিজেদেরকে তাইফায়ে মানসূরা বলে মনে করছে এবং কেবল নিজেদেরকেই নাজাতের ঠিকাদার বলে ভাবছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হলো: সত্য অনুধাবনের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে, সরল-সঠিক পথের মণিমাণিক্য কুড়িয়ে এনে সিরাতে মুস্তাকীম প্রত্যাশীদেরকে উপহার দেয়া। এতে প্রতিটি মুসলিম নিজের ব্যাপারে ও নিজের দ্বীনের ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ নির্ভর সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন। এতসব দল আর সংগঠনের গোলকধাঁধায় কেউ আর বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের এই অংশে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাইফা আল মানসূরার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলীসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হবে।

আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত সেই দলের কথাই বলছি, যাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, যাদের দল ভারী করা, সম্ভব হলে যাদের কাতারে শামিল হয়ে কাজ করা, সম্ভব না হলে দু'আর মাধ্যমে, পক্ষাবলম্বনের মাধ্যমে এবং দল ভারী করতে অন্যান্যদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যাদেরকে সাহায্য করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। আমাদের এই রচনার উদ্দেশ্য আরো হলো: সর্বস্তরের মানুষ যেন বুঝতে পারে, তাইফা আল মানসূরা হওয়াটা অন্তঃসারশূন্য এমন কোনো দাবি নয়, কাজের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। আর না তা কোনো বাস্তব রূপায়ণ বিবর্জিত স্লোগান মাত্র। দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন ব্যতিরেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করার মত কোনো সুখ ভাবনা নয় এই তাইফা আল মানসূরা। বরং তা তো হল শরীয়ত নির্দেশিত বিরাট দায়িত্ব পালন করা এবং ফারায়েজে রাব্বানিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। আর আল্লাহই সরল সঠিক পথের দিশা দানকারী।

প্রথম বৈশিষ্ট্য:

সদা বিজয়ী তাইফা আল মনসূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত সর্ববিষয় সংবলিত সরল মানহাজের পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ করা। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিকৃতি সাধন অথবা দ্বীনের মাঝে নব উদ্ভাবনের আশ্রয় তাঁরা গ্রহণ করেন না। সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন বিশেষ করে প্রথম তিন যুগের মু'মিনগণ যাদের ব্যাপারে কল্যাণ, সুপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াতের সাক্ষী দিয়েছেন স্বয়ং নবীজি, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাইফা আল মানসূরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সর্বসম্মত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন-

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর যারা তাঁদের পরে আসবে, অতঃপর যারা তাঁদের পরে আসবে।"[৯৯]

তিনি ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

"قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ "

"আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পরিষ্কার পথের ওপর রেখে গেলাম, যার রাত দিনের মত (উজ্জ্বল) । ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না। আমার পর যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সে সময় তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের

[৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৫১, সহীহ মুসলিম. হাদীস নং- ৬৬৩৫

সুন্নাহর মাঝে যেসব তোমাদের জানা আছে, সেগুলোকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে।” [১০০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, “ফেরকায়ে নাজিয়া তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছেন হাদীস ও সুন্নাহর অনুসারীগণ। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে এমনভাবে নিজেদের অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেন না যে, নিজেদেরকে সেই জামাতের লোক মনে করে। এঁরা এমন ব্যক্তি যারা নবীজির বাণীসমূহ ও নবী জীবনের সব রকম অবস্থা সম্পর্কে অবগত। এবং তন্মধ্যে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ও বিতর্কিত সূত্রে বর্ণিত বিষয়গুলোকে পৃথকীকরণে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। তাঁদের ইমামগণ এসব বিষয়ে ফকীহ্ সুলভ জ্ঞান রাখেন। সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের মর্ম অনুধাবনে তাঁরা সক্ষম। এসবের সত্যায়ন, বাস্তবায়ন, এগুলোর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ—সবদিক থেকেই হাদীসের অনুসরণে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর। নবীজির আনীত কিতাব ও হিকমাহ্'র সুস্পষ্ট আলো গ্রহণ করে তাঁরা মূলনীতি রচনা করে থাকেন। নবীজির আনীত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত বলে যে বিষয় প্রমাণিত হয় না, তাঁরা তেমন কোনো বিষয়ের প্রবক্তা নন। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ কিতাব ও হিকমতের যেসব বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, কেবল সেগুলোকেই তারা মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। সেগুলোকেই আকীদাহ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেগুলোর ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করে থাকেন।”

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য:

তাইফা আল মানসূরার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হল, তাঁরা আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখেন এবং আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন। তাঁরা এমন কাউকে কাছে টেনে নেন না, যাকে আল্লাহ দূরে ঠেলে দিয়েছেন। একইভাবে তারা এমন কাউকে দূরে ঠেলে দেন না, যাকে আল্লাহ কাছে টেনে নিয়েছেন। সত্যবাদী, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনকারী এবং শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনকারী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাঁদের অন্তরে থাকে ভালোবাসা। কারণ, ইসলামের

[১০০] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪৩

অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহর সঙ্গে ব্যক্তির নৈকট্য অনুপাতেই সম্পর্ক ও ভালোবাসা স্থাপিত হয়ে থাকে। মু'মিন ব্যক্তিকে তারা ছোট-বড়, সুলভ-দুর্লভ সব কিছু দিয়েই সবরকম সাহায্য করে থাকেন। তাইফা আল মানসূরার মূলনীতি, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা— স্বদেশ, স্বজাতি, ভাষা, গোত্র, পরিবার ইত্যাদি কোনো কিছুর ভিত্তিতে ভালোবাসা নির্ণিত হয় না। বরং তারা হয়ে থাকেন নানা গোত্রের, নানা দেশের। কিন্তু নির্ভেজাল তাওহীদ তাঁদের অন্তরকে একীভূত করে দেয়। এমন সত্যপন্থী জামাতের সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। তাঁরা আল্লাহর ভালোবাসায় একত্রিত হন এবং আল্লাহর ভালোবাসায় পৃথক হন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কারীমের বহু জায়গায় মহৎ এই গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গুণ অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। কারণ, এই দ্বীনের মাঝে তা একটি সুদৃঢ় ভিত্তি, মুসলিমের জন্য যার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٧١﴾

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই ওপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।[১০১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী এ বিষয়েই-

"أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل".

[১০১] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ৭১

"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হচ্ছে আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা।"[১০২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

مَن أحبَّ للَّهِ وأبغضَ للَّهِ ، وأعطى للَّهِ ومنعَ للَّهِ فقدِ استَكْملَ الإيمانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসবে, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহর জন্য দান করবে এবং আল্লাহর জন্য ফিরিয়ে দেবে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে ফেলল।"[১০৩]

মহান মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ রোকন আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "হে আমার ভাইয়েরা! অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন। আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূল ভিত্তি, প্রথম ও শেষ কথা, প্রধান ও চূড়ান্ত বিষয়—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে আঁকড়ে ধরুন। এর মর্ম অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। এই কালিমাকে এবং এই কালিমার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে ভালবাসুন। তাদেরকে ভাই মনে করুন, যদিও তারা দূরের কেউ হয়। অপরদিকে তাগুতকে সর্বাত্মকভাবে অস্বীকার করুন। প্রত্যাখ্যান করুন। বর্জন করুন। তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করুন। তাগুতকে ঘৃণা করুন। যারা তাগুতকে ভালবাসবে, তাগুতের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করবে, তাগুতকে সর্বোতভাবে বর্জন না করবে, আপনারা তাদেরকেও ঘৃণা করুন। যারা বলবে, তাগুতের প্রশ্নে আমি নিরপেক্ষ, আল্লাহ তা'আলা তাগুতদের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেননি, এমন মতের প্রবক্তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাচার করছে। আল্লাহকে অপবাদ দিচ্ছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাগুতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের অবকাশ রাখেননি। আল্লাহ তা'আলা তাগুতের প্রতি কুফরি করাকে, তাগুতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে ফরজ করেছেন, যদিও ব্যক্তি ও তাগুতের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থাকুক কিংবা পিতৃত্বের। তাই, অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহকে

[১০২] সহীহ জামিউস সগীর, হাদীস নং-২৫৩৯
[১০৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৬৮১

ভয় করুন! আর উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলুন। কারণ, এতে আপনারা নিজেদের রবের সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারবেন যে, ইতিপূর্বে তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করেননি। হে আল্লাহ! আপনি ইসলামের ওপর আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে আমাদেরকে মিলিত করুন!"

শরীয়তের এসব দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য এবং এজাতীয় আরো বহু নির্দেশনামূলক বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভিনদেশী মূলগত কাফের হোক অথবা স্বদেশী স্থানীয় কাফের, সকলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠার দাবিদার প্রতিটি জামাতের গঠনতন্ত্রে অলঙ্ঘনীয় প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। নিজেদের দাবির সত্যতা প্রমাণে এই বিষয়টিই আসল মানদণ্ড হওয়া উচিত।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য:

যেসব গুণের কারণে সদা প্রতিষ্ঠিত সাহায্যপ্রাপ্ত জামাতটি অন্যান্য জামাতের মাঝে অনন্য, তেমনি আরো একটি গুণ হচ্ছে— আরব-অনারব সর্বস্থানের তাগুত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তলোয়ার, জবান, বয়ান, বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ পরিচালনা। এ বৈশিষ্ট্যটি তাইফা আল মানসূরার প্রধান পরিচয় ও সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশ্য নিদর্শন হতে হবে। প্রত্যেক যুগের বিশেষ করে শেষ যুগের তাইফা আল মানসূরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন । তাওহীদবাদী সাহায্যপ্রাপ্ত দলের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

"সর্বদাই এমন হবে যে, এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর মুসলিমদের একটি জামাত একে টিকিয়ে রাখতে লড়াই করে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত এমনটাই চলবে।" [১০৪]

নবীজি ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

[১০৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬২

"নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি জামাত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করে যাবে।"[১০৫]

তিনি ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. رواه أبو داود

"নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি জামাত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করে যাবে। তাঁরা তাদের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি তাদের শেষ অংশ মাসীহ্ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"[১০৬]

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاَحَ وَقَالُوا لاَ جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ وَقَالَ « كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِىَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা ঘোড়াকে অবহেলা করছে এবং হাতিয়ার রেখে দিয়েছে। বলছে, এখন কোনো জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে'। তখন নবীজি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে উঠে বললেন, 'তারা মিথ্যা বলেছে। লড়াই তো কেবল শুরু হলো। আর নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করবে। আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমে একটি দলের অন্তরকে বক্র করে দেবেন এবং তাঁদেরকে সে দলের মাধ্যমে রিজিক দান করবেন। কেয়ামত পর্যন্ত এমনটাই হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

---

[১০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৩

[১০৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৪৮৬

বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলবে। আর অশ্বের ললাটে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ লিখিত থাকবে”।[১০৭]

তিনি ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

لا تزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي منصورينَ لا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ حتى تقومَ الساعةُ

“নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদের ক্ষতি কামনাকারীরা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[১০৮]

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহকে যখন তাইফা আল মানসূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, “তাঁরা ঐ সমস্ত লোক যারা রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করবে তাঁরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।”

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সিরিয়া, মিশর এবং এজাতীয় অন্যান্য অঞ্চলে যে জামাত রয়েছে, তারাই বর্তমান সময়ে দ্বীন ইসলামের পক্ষে লড়াই করছে। নবীজি ﷺ থেকে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত বহু হাদীসে যে তাইফা আল মানসূরার কথা বলা হয়েছে, সেই তাইফার অন্তর্ভুক্ত হবার সবচেয়ে বেশি হকদার উপরোক্ত জামাত। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস হচ্ছে — নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেয়ামত কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরোধীরা ও ক্ষতি কামনাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না…’!

হে আমার ভাই! ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তাঁর হুকুমত কায়েম করার জন্য এবং তাঁর শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য তলোয়ার ও জবানের মাধ্যমে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্, জাহেলিয়াতের জমানায় হক্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত জামাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য:

---

[১০৭] সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং-৩৫৬১
[১০৮] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-২১৯২

হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাইফা আল মানসূরার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করবে। শয়তান হয়ে তাঁদের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখবে। কোনো দাওয়াতকে জাহেলিয়াতের অনুসারীরা যদি অপছন্দ না করে, বুঝতে হবে, তা অসম্পূর্ণ দাওয়াত। ওই দাওয়াতের আহ্বায়ক জামাত পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট হকের ওপর নেই । বুঝতে হবে এমন জামাতের তাওহীদ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। নিঃসন্দেহে এমন জামাতের মানহাজে কোনো ত্রুটি রয়েছে। পারস্পরিক এই বিদ্বেষ কেনইবা তৈরি হবে না অথচ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল নবীজিকে তাঁর দাওয়াতি জীবনের শুরুতেই দাওয়াতের পথের নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনার মতো ইতিপূর্বে যারাই পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তাঁদেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে।'

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূলের অনুসারীদের মধ্যে যারা রাসূলের আনীত বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেবে, অনিবার্যভাবেই রাসূলের অবস্থা ও তাঁদের নিজেদের অবস্থার অনুপাতে শয়তানের অনুসারীদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। ওয়াল্লাহুল মুস্তাআন!"

জি হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম যারাই পৌঁছাবে তাঁরাই শত্রুতার শিকার হবে। কারণ, বাতিলকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবার দাওয়াত নিয়েই রাসূল দাঁড়িয়েছিলেন। অসম্পূর্ণ সমাধান নবীজির দাওয়াতের মাঝে নেই। নবীজির দাওয়াত মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার সেসব গোষ্ঠীর মসনদ গুঁড়িয়ে দেবার দাওয়াত, যারা আল্লাহর জমিনে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে। যারা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে অনিষ্টের সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত জামাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা সর্বাঙ্গীণভাবে এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। তাঁরা একে এমনভাবে ভাগ করেন না যে, কিছু অংশের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী থাকবেন, আর অবশিষ্ট অংশগুলোকে পরিত্যাগ করবেন। বরং তারা দ্বীনের প্রতিটি অঙ্গকে তার যথার্থ মর্যাদা দান করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদাঙ্ক পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেন, যিনি তলোয়ার ও জবানের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে

জিহাদ করেছেন। যিনি নিজের কওমকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদেরকে সতর্ক করেছেন। যিনি নিজ সাথীদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছেন, মেধা-বুদ্ধিকে শানিত করেছেন। আর এমনভাবে নিজ রবের ইবাদাত করেছেন যে, তাঁর উভয় পা মোবারক ফুলে গেছে এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়েছে। আমাদের পিতামাতা উৎসর্গিত হোক তাঁর জন্য। আল্লাহর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর...।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿الأحزاب: ٢١﴾

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। [১০৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴿البقرة: ٢٠٨﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। [১১০]

সাদী রাহিমাহুল্লাহ নিজ তাফসীর গ্রন্থে (উক্ত আয়াতের তাফসীরে) বলেন,

"এটি মু'মিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে নির্দেশ যে, তারা যেন দ্বীন ও শরীয়তের সব কিছুরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর দ্বীনের কোনো কিছুকেই যেন তারা বর্জন না করে। তারা যেন এমন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হয়, যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশ যদি প্রবৃত্তির অনুকূল হয়; তবে তা পালন করে। আর যদি প্রবৃত্তির চাহিদা বিরোধী হয়; তবে তা বর্জন

[১০৯] সূরা আল-আহযাব; ৩৩: ২১
[১১০] সূরা আল-বাকারা; ২: ২০৮

করে। অথচ উচিত ছিল প্রবৃত্তিকে দ্বীনের অনুগামী বানানো, সামর্থ্য অনুযায়ী কল্যাণকর কাজ করা, সামর্থ্য না থাকলে চেষ্টা করা এবং নিয়্যত করা। কারণ, নিয়্যতের কারণে সে প্রতিদান লাভ করবে।”

তিনি যথার্থই বলেছেন। তাইফা আল মানসূরার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, তাঁরা তাঁদের নবীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাই নববী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আল্লাহর পথে লড়াই করে থাকেন। নিজেদের অন্তরকে ইবাদাতের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে থাকেন। আর ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য তলোয়ার ও জবানের মাধ্যমে জিহাদ করে থাকেন।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য:

তাইফা আল মানসূরার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার অনুসারী ও ধারক-বাহকরা বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আর রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের অবস্থা এমনই। কুরআনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾

‘তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্নাতে চলে যাবে, (অথচ) পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের (বিপদের) মত কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি। তাদের ওপর (বহু) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তা’আলার সাহায্য কবে আসবে? তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। [১১১]

---

[১১১] সূরা আল- বাকারা; ২: ২১৪

কোনো জামাত যদি দাওয়াতের পথে দাওয়াত অনুপাতে পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়, যথেষ্ট পরিমাণে বিপদ-আপদের মুখোমুখি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই জামাত পুরোপুরি সঠিক পথের ওপর নেই। বরং নবী-রাসূলদের পথ থেকে তারা সরে গেছে। রাসূলগণের পন্থা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর পথে আমাকে যতটা কষ্ট দেয়া হয়েছে ততটা আর কাউকে দেয়া হয়নি।”

সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিপদ-আপদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, “নিশ্চয়ই ঈমান পৃথিবীতে আল্লাহর আমানত। কেবল তাঁরাই এ আমানত বহন করে থাকেন, যাদের মাঝে যোগ্যতা, আমানত বহনের সক্ষমতা এবং অন্তর জুড়ে নির্ভেজাল ইখলাস ও একনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁরা তো ঐ সমস্ত লোক, যারা আরাম-আয়েশ, শান্তি-শৃঙ্খলা, পার্থিব ভোগ-বিলাসের ওপর এই আমানতকে প্রাধান্য দানে বদ্ধপরিকর। ভূপৃষ্ঠে খিলাফত প্রতিষ্ঠা, মানবজাতিকে আল্লাহর পথে পরিচালনা, বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম—এগুলোই হচ্ছে ওজনদার সেই মহান আমানত। মানুষের ওপর অর্পিত এই আমানত আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ কারণেই বিপদের সময় ধৈর্য ধারণের বিশেষ পন্থার প্রয়োজন।”

তিনি আরো বলেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কারো অন্তরে ঈমানের মূল বিষয় পূর্ণতা লাভ করে না, যতক্ষণ ঈমানের জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করে। কারণ, বাস্তব ময়দানে জিহাদকালেও ব্যক্তিকে প্রথমে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়। তখন তার জন্য ঈমানের এমন কিছু দিগন্ত উন্মোচিত হয়, আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তার মাঝে বসে থেকে যা কখনোই তার জন্য উন্মোচিত হতো না। মানুষ ও জীবন সম্পর্কিত এমন কিছু বাস্তবতা তার সামনে ফুটে ওঠে, যা এই পন্থা অবলম্বন ছাড়া কখনই সম্ভব হতো না। তখন তার ব্যক্তিত্ব, অনুভব, অনুভূতি, মূল্যবোধ, কল্পনা, অভ্যাস, স্বভাব, আবেগ, আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া—সবকিছুই এমন এক উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, জ্বালাময় তিক্ত এই অভিজ্ঞতা ছাড়া যা কখনোই হওয়ার ছিল না।”

ঈমানের সারবস্তু পূর্ণরূপে বিকশিত হতে হলে জামাতকে ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। জামাতের প্রতিটি সদস্যকে ঈমানের

হাকীকত বা সারবস্তু সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করতে হয়। সদস্যকে নিজের লক্ষ্যবস্তুর মর্মকথা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হতে হয়। এবং জামাতকে নিজ কাঠামোর প্রতিটি ইট সম্পর্কে, তাঁদের ধারণ ক্ষমতা ও সংঘর্ষের সময় তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দৃঢ়তা সম্পর্কে জানতে হয়।

সপ্তম বৈশিষ্ট্যঃ

তাইফা আল মানসূরার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে আদর্শকে তাঁরা ধারণ করেছেন, যে আদর্শের প্রতি তাঁরা ঈমান এনেছেন, সত্য সঠিক সেই মতাদর্শের জন্য তাঁরা সব রকম বিপদ-আপদ সহ্য করেন। বিরোধীদের টিটকারি ও অধিকাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা আদর্শের ওপর টিকে থাকেন। এই পথে তাঁরা সব রকম ত্যাগ স্বীকার করেন। এর জন্য তাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দেন, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেন। আর তাঁর কারণ হলো, উক্ত আদর্শকে তাঁরা এমন কোনো পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, চাইলেই যা বেচাকেনা করা যায়। বরং এ তো হলো এমন পোক্ত ঈমান, সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর চলতে যা তাঁদেরকে নির্ভুল নির্দেশনা দান করে।

আমাদের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে ঈমানের পয়গাম গ্রহণকারীদের সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। তার একটি প্রশ্ন ছিল- 'ইসলাম গ্রহণের পর এর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কেউ কি কখনো তা ত্যাগ করেছে'? আবু সুফিয়ান উত্তর দিয়েছিলেন, 'না'। আসলে এমনটাই হয়। ঈমানের সতেজতা অন্তরকে স্পর্শ করলে কেউই এর প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হতে পারে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হাদীস ও সুন্নাহর অনুসারী উলামায়ে কেরাম এবং পুণ্যবান সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে কারো ব্যাপারে এমনটা জানা যায় না যে, তিনি নিজ বক্তব্য ও আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে ফিরে এসেছেন। বরং আদর্শের জন্য মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেন তাঁরাই। যত রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হোক না কেন এবং যতপ্রকার বিপদ-আপদের মুখোমুখি হতে হোক না কেন, তাঁরা নিজেদের বক্তব্য থেকে একচুলও সরে আসেন না। নবীগণ এবং পূর্ববর্তীদের মধ্যে নবীদের অনুসারীদের

অবস্থা এমনই ছিল। যেমন আহলে উখদুদ এবং এদের মত আরও যারা রয়েছেন। এমনিভাবে এই উম্মাহর সালফে সালেহীন যাদের প্রথম সারিতে রয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও অন্যান্য ইমামগণ। এটি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ এমনও বলতেন, 'এই দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করেনি এমন কারো প্রতি তোমরা ঈর্ষা করো না'। তিনি আরো বলতেন, 'আল্লাহ অবশ্যই মু'মিনকে পরীক্ষা করবেন। যদি সে ধৈর্য ধারণ করে তবে তিনি তাঁর মর্যাদা উন্নীত করবেন'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿العنكبوت: ٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿العنكبوت: ٣﴾

'আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী'।[১১২]

আশা করি প্রতিটি মুসলিমের কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী এবং নবীজি ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণকারী বিজয়ী দলটির একটি নিদর্শন হলো, বিপদ-আপদ, অপরিচিতি ও দেশান্তর, ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি।

সত্যপন্থী তাইফা আল মানসূরার প্রধান নিদর্শনগুলো আমরা জানতে পারলাম। এখন আমাদেরকে জানতে হবে, বর্তমানে ইসলামী অঙ্গনে তৎপর কোন জামাতের মাঝে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে?

কাফেরদের জুলুম, আগ্রাসন মুসলিমদের কোনো একটি ঘরকেও অবশিষ্ট রাখেনি। এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে যে কারো কাছে খুব সহজেই ধরা পড়বে, তাতারীদের আগ্রাসন কালের মুসলিমদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার খুব বেশী তফাৎ নেই। এসব ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় মানুষের শ্রেণীবিভাগ, যা শাইখুল

---

[১১২] সূরা আল-আনকাবুত; ২৯: ১-৩

ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিশ্লেষণ করেছেন—তাও যেন ওই যুগের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। শাইখুল ইসলাম ফিতনার জামানায় সকল মানুষকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলেন,

“এজাতীয় বিপর্যয়ের সময় মানুষ কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ হলো: তাইফা আল মানসূরা। তাঁরা হলেন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী মুজাহিদিন। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো: খোদ গোলযোগ সৃষ্টিকারী এবং নামধারী মুসলিমদের সহযোগী। তৃতীয় ভাগ হলো: হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগকারী মানুষ যদিও তারা সত্যিকার অর্থে মুসলিম।”

এখন প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত, সে ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত মুজাহিদের দলে থাকতে চায়, নাকি জিহাদ পরিত্যাগকারীদের দলে নাকি সরাসরি বিরোধিতাকারীদের দলে? এর বাইরে চতুর্থ কোনো দল বা ভাগ নেই।

জিহাদের মাঝে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে, তা পরিত্যাগের পরিণতি হচ্ছে উভয় জগতের ক্ষতি। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾التوبة: ٥٢﴿

‘আপনি বলে দিন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে দুই কল্যাণের কোন এক কল্যাণ ছাড়া অন্য আর কিসেরই বা অপেক্ষা করতে পারো’?[১১৩]

আল্লাহ তা’আলা বোঝাচ্ছেন, হয় সাহায্য ও বিজয় নয়ত শাহাদাত ও জান্নাত। মুজাহিদদের মাঝে যারা বেঁচে থাকবেন, তাঁরা হবেন সম্মানিত গাজী। তাঁদের জন্য একদিকে থাকবে দুনিয়ার প্রতিদান, অন্যদিকে থাকবে আখিরাতের উত্তম বিনিময়। আর তাঁদের মাঝে যারা নিহত হবেন, তাঁদের যাত্রা হবে জান্নাতের দিকে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা উপরোক্ত বিপর্যয়কালীন মুসলিমদের অবস্থা থেকে খুব একটা আলাদা নয়। বরং অকল্যাণের দিক থেকে আমরা তাদের সময়ের চাইতে

---

[১১৩] সূরা আত-তাওবাহ; ৯: ৫২

বহুগুণে এগিয়ে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাঁদের কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট। আর ঠিকই এই ফিতনায় মুসলিমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

এক ভাগ আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত করছেন না। লড়াই পরিত্যাগে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না। কোনো গুজব প্রচারকারীর গুজবে কান দিচ্ছেন না। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কোনো মহলের কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন না। তাঁরাই হচ্ছেন আল্লার রাস্তার মুজাহিদ। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁরাও যারা সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করছেন।

আরেক পক্ষ হচ্ছে, যাদের শিরায় রক্ত শুকিয়ে গেছে। ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের উক্তি— 'হয় আমাদের পক্ষে না হয় সন্ত্রাসের পক্ষে' তাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে। ডব্লিউ বুশের কথার অর্থ হচ্ছে, হয় ক্রুসেডারদের পক্ষে না হয় ইসলাম ও তার প্রতিরক্ষা শক্তি মুজাহিদদের পক্ষে। এই শ্রেণীটি ক্রুসেডার ও তাদের আমলাদের তোষামোদ আর চাটুকারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এরা হলো স্থানীয় মুরতাদ শাসকবর্গ। এদের মাঝে অনেকে তো আবার একেবারে কাফেরদের গুপ্তচর ও মুখপাত্রে পরিণত হয়ে গেছে। কাফেররা নিজেদের জন্য যতটা না কাজ করছে, এরা তার চাইতেও বেশি কাফেরদেরকে সাহায্য করছে!

আরেকটি শ্রেণী হলো: যারা এদিকেও নেই ওদিকেও নেই। জীবিকা উপার্জনের পেরেশানি আর ঝক্কি-ঝামেলায় তারা আটকা পড়ে আছে। দুনিয়াজুড়ে কি হচ্ছে, মুসলিমদের অবস্থা কোন দিকে গড়াচ্ছে, দ্বীন-দুনিয়া নিয়ে কি সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে— কোনটা নিয়েই তাদের মাথা ব্যথা নেই।

বর্তমান সময়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত ইসলামের প্রতিরক্ষা শক্তিটিই তাইফা আল মানসূরা। তাতারীদের আগ্রাসনের সময় মুসলিমদের অবস্থার বিবরণে শাইখুল ইসলামের উপরোক্ত বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে আলোচ্য প্রকারভেদ সামনে রেখে বিচার করলে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কাজেই, তাঁদের জনবল বৃদ্ধি করা, তাঁদের কাতারে শামিল হওয়া, জান ও মালের বিনিময়ে তাঁদেরকে সাহায্য করা, অন্ততপক্ষে তাঁদের জন্য দু'আ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব।

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যুগের তাইফা আল মানসূরার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, “আর সিরিয়া, মিশর ও এজাতীয় অন্যান্য অঞ্চলে বর্তমান সময়ে দ্বীন ইসলামের পক্ষ হয়ে লড়াইরত দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত তাইফা আল মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হবার সবচেয়ে বেশি হকদার। নবীজি থেকে সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এ দলের কথা এসেছে। যেমন: ‘নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে এবং তাঁদেরকে ফিরে আসতে বলবে, তারা কেয়ামত পর্যন্ত এই দলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’

শাইখুল ইসলামের উপরোক্ত বক্তব্য হেদায়েত প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। তবুও বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা আরও কিছু সংযোজন করতে চাই। এতে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সুহৃদ পাঠকমণ্ডলী পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারবেন, আলোচ্য বৈশিষ্ট্যাবলী আল্লাহ রাস্তার সেসব মুজাহিদদের মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে, যারা তাঁদের নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের মানহাজ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। যারা সর্বাঙ্গীণভাবে তাওহীদ, এর প্রচার-প্রসার এবং ভূপৃষ্ঠে তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের দিকে আহ্বান করে থাকেন। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের দাবির যথার্থতা প্রমাণে উপরোক্ত মহান জামাত সম্পর্কে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য একটু গভীরে ডুব দেবো। আমরা দেখব, আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে তাঁদের মাঝে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথমত:

মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ, তাঁদের দাঈ ও কর্ণধারগণ আরব,অনারব সর্বস্থানের তাগুত গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে গর্জন করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। কোনো লুকোচুরির আশ্রয় নেননি । তাগুত গোষ্ঠীর শক্তিমত্তা, বাহ্যিক চাকচিক্য, সামরিক সক্ষমতা ও প্রচারমাধ্যমের দিকে মুজাহিদরা কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। তাঁদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে ইতিপূর্বে এভাবে ঘোষণা দিয়ে গেছেন তাঁদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿المتحنة: ٤﴾

'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে'। [১১৪]

সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ভিন্ন আরাধ্য সকল তাগুতগোষ্ঠীকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন। হয় আল্লাহর শরীয়ত সমুন্নত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবেন, নয়তো তাঁরা এই লক্ষ্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেবেন- এমনই তাদের চিন্তাধারা।

দ্বিতীয়ত:

জিহাদী দলগুলোর কর্মীরা নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে আল্লাহর বরকতের ওপর নির্ভর করে তাঁরই নির্দেশমত সব কাপুরুষ তাগুতের দল আর ভীরু মুরতাদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সুদীর্ঘ এই দুর্গম পথে তাদের অনুপ্রেরণা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী-

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

'সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে'।[১১৫]

জি হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উত্তরসূরী। অন্যেরা যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেছে, সবাই যখন হাত গুটিয়ে বসে আছে, তখন তাঁরা তাওহীদের প্রতিরক্ষা শক্তি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যখন অনেকেই শিরকী পার্লামেন্টগুলোকে জিহাদী কাজের কেন্দ্র ধরে নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে আছে, তখন তাঁরা তাওহীদের প্রতিরক্ষায় সরাসরি জিহাদের ময়দানে রয়েছেন।

---

[১১৪] সূরা আল-মুমতাহিনা; ৬০: ৪
[১১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৩

এই কাফেলার বীর সেনানীরা সম্মান আর গৌরবের চাদর জড়িয়ে বিমান নিয়ে ভূপৃষ্ঠে জাহেলিয়াতের সাম্রাজ্যের বুরুজগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এই কৃতিত্ব মুসলিম সন্তানেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করেছে। আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামীয়ার অধীনে, আবু উমর বাগদাদীর নেতৃত্বে বিলাদুর রাফেদাইন (দুই নদীর দেশ) ইরাকে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামীয়াহ্'র অধীনে[১১৬], এমনিভাবে আনসারুস সুন্নাহ সহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে লড়াইকারী আরো বহু হকপন্থী দলের অধীনে কালিমার পতাকাবাহীরা সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা মুসলিমদের সামনে রয়েছে।

তৃতীয় বিষয়:

আল্লাহর নির্দেশ পালন করে লড়াইকারী জিহাদী জামাতগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, তাঁরা কতটা কষ্ট ভোগ করছেন! শেষ যুগে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বর্ণিত অপরিচিতি কতটা তাদের মাঝে পাওয়া যাচ্ছে! মানুষ আজ তাঁদের প্রতি অবিচার করছে। জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা তাঁদেরকে শত্রু জ্ঞান করছে। নিকটস্থরা তাঁদেরকে থেমে যেতে বলছে। দূরের যারা তারা বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট-

"بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ" رواه مسلم.

"ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়। আর অচিরেই তা পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ"। [১১৭]

---

[১১৬] লেখাটি ২০০৬-২০০৭ এর দিকে রচিত। যখন দাউলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়া নামক দলটি আল-কায়েদার অধীনে বাইয়াতভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময় এ দলটির চরমপন্থা এবং অবাধ্যতার কারণে আল-কায়েদা এর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। দলটি পরে 'দাউলাতুল ইসলাম' বা আইএস নাম গ্রহণ করে। এরা তাকফিরের ক্ষেত্রে খাওয়ারিজদয়ের বিকৃত উসুল গ্রহণ করেছে। এবং তাদের দলের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাব্যস্ত করে, নানা দলকে তাকফির করেছে। উল্লেখ্য আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ ইরাকের 'দাউলাতুল ইসলামিয়া আল ইরাক'-কে একটি ইমারত গণ্য করতেন, খিলাফাহ গণ্য করতেন না। যা শাইখের উপরের বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট।

[১১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৯

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “নবীজির যুগ তো সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, ঈমান আনার কারণে মুসলিমরা কাফেরদের আধিক্য এবং তাদের জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও নিজেদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার দরুন অপরিচিত হয়ে পড়তেন। একইভাবে এই উম্মতের শেষাংশ যখন নিজেদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবে, যখন তা আঁকড়ে ধরবে, রবের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যখন তাঁরা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে, আর ওই অবস্থায় যখন পাপাচার ছড়িয়ে পড়বে,আল্লাহর নাফরমানির যখন হিড়িক পড়ে যাবে, ফ্যাসাদ হাঙ্গামা আর কবিরা গুনাহের যখন ছড়াছড়ি থাকবে, ওই পরিস্থিতিতে উম্মাহর সেই শেষ অংশটাই হবে গুরাবা তথা অপরিচিত। ওই অবস্থায় তাঁদের আমলের সওয়াব বহুগুণ বেড়ে যাবে, যেমনটা ঘটেছিল এই উম্মাহর প্রথমাংশের বেলায়। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস দ্বারা “ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় আর অচিরেই তা পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ!”

জি হ্যাঁ, হকের উত্তরসূরীরা ও সত্যের পতাকাবাহীরা আজ অপরিচিত আর বিতাড়িত। হকের সাহায্যকারী আজ খুবই কম। লা 'হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম!

চতুর্থ বিষয়:

নিজেদের মতাদর্শ ও মতবাদের ওপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে জিহাদী দলগুলো বর্তমান সময়ে প্রবাদতুল্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল এমন এক সত্য পন্থার জন্য তাঁরা টিকে আছেন, যার প্রতি তাঁরা ঈমান এনেছেন, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন— চির অম্লান সেই আদর্শের নাম হচ্ছে ইসলাম।

তাঁদের ইতিহাস এমন অনেক উদাহরণে ভরপুর, যা জিহাদ পরিত্যাগকারীরা কোনমতেই বুঝতে পারে না। কারণ, পরিত্যাগকারীরা তো জিহাদের পথে অবিচলতা এবং এর কষ্ট সহ্যের স্বাদ আস্বাদন করেনি। এইতো আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহিমাহুল্লাহ- বিশজন লোকের জন্য[১১৮] নিজের দেশকে উৎসর্গ করে দিয়ে এই উম্মাহর সৌভাগ্যবান পূর্বসূরীদের কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এইতো মহান নেতা শাইখ উসামা বিন লাদেন— দ্বীনের সাহায্যের

[১১৮] যাদেরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন।

জন্য নিজের সমস্ত সহায় সম্পত্তিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। অতঃপর দ্বীনি ভাইদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে আর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কতটা ধনাঢ্য, কতটা মর্যাদাবান এবং কতটা প্রভাবশালী ছিলেন, তা কী আর বলে দেয়া লাগে! তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ-সহ বরকতময় জিহাদী আন্দোলনের আরো অনেকেই।

তাঁদের এই দৃঢ়তা ও অবিচলতার কথা অন্তঃসারশূন্য এমন দাবি নয় যে, তার পক্ষে কোনো দলীল নেই। বরং এগুলো এমনই চাক্ষুষ বাস্তবতা ও সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা, পক্ষ-বিপক্ষের সকলেই যা স্বীকার করে নিয়েছে। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য এবং অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকেই!

আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত গৌরবের অধিকারী মোবারক এই জামাতের সুকীর্তি আলোচনা করে মুসলিমদেরকে আফগানিস্তান, ইরাক, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, ককেশাস কিংবা ইয়ামেন—যেখানেই হোক তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। এ কারণেই আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমরাই শুধু নয়; বরং সুস্থ রুচি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ প্রতিটি মুসলিম এই জামাতের সরল মানহাজ, এই মানহাজের সামগ্রিকতা, এর গভীর আবেদন, প্রবৃত্তির বাঁধন ছিন্ন করে সালফে সালেহীনের মতাদর্শ আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে এই মানহাজের অনুসারীদের অঙ্গীকার পূরণ, তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁদের নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রত্যক্ষ করেছেন।

যদিও এই জামাতের সাহায্যকারীরা সংখ্যায় অল্প, এই পথে যাত্রাকারীদের ভীষণ অভাব, এই পথের বিপুল কল্যাণ পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা বিরাট, কিন্তু তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির এই দুর্গম গিরি আর দুর্লঙ্ঘনীয় সুদীর্ঘ পথে তাঁদের সান্ত্বনা হচ্ছে গুরাবাদের নেতা নবী কারীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী-

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ".

“নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি জামাত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদেরকে বারণকারীরা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহর নির্দেশে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থাতেই থাকবে।”[১১৯]

অন্যত্র নবীজি ﷺ- ইরশাদ করেছেন-

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

“নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে”।[১২০]

আল্লাহ তা’আলা ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন! তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ ‘মাদারিজুস সালেকীনে’ সাবধান করে দিয়ে বলেন, “সীরাতে মুস্তাকীমের তলবকারীরা এমন একটা বিষয়কে লক্ষ্য বানিয়েছেন, অধিকাংশ মানুষ যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই চলার পথের লোক-স্বল্পতা ও অবিরাম কষ্টের মাঝে তাঁরা সফরসঙ্গী পেতে আগ্রহী হবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ, একাকীত্বে সঙ্গী-সাথীর সান্নিধ্য পেতে স্বভাবতই মন উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই, আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা এই পথে তাঁদের সঙ্গীদের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথীবর্গ হলেন ওই সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ তা’আলা নিজ নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন অর্থাৎ আম্বিয়া, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহীন—সঙ্গী হিসেবে তাঁরা কতই না উত্তম! আল্লাহ তা’আলা সঠিক পথের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পথের ঐশী পুরস্কারপ্রাপ্ত যাত্রীদের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন, যাতে হেদায়েতের পথের যাত্রী এবং সীরাতে মুস্তাকীমের পথচারী নিজের যুগ ও সমকালীন লোকদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারেন। যাতে তিনি বুঝতে পারেন, এই পথে তাঁর সঙ্গী-সাথী হচ্ছেন ওই সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা’আলা নেয়ামত দান করেছেন। আর তাই বিরোধিতাকারীদের কথায় যাতে তারা কর্ণপাত না করেন। কারণ, বিরোধিতাকারীরা যদিও সংখ্যায় অনেক, কিন্তু মর্যাদা বিচারে তারা অনেক নিচে। সালাফদের ভেতর কেউ কেউ এমনটাই বলেছেন যে, তোমাকে সত্যের পথে

---

[১১৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৯

[১২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৩

থাকতে হবে এবং এ পথের অনুসারীদের স্বল্পতার কারণে হতাশ হওয়া যাবে না। আর বাতিল পথ এড়িয়ে চলতে হবে এবং সে পথের অনুসারীদের আধিক্য দেখে প্রতারিত হওয়া যাবে না। আর যখনই পথ চলতে গিয়ে নিঃসঙ্গতার অনুভব হবে, তখনই পূর্ববর্তী সফরসঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহ মনের মাঝে সঞ্চার করতে হবে। আর এর বাইরে অন্য সবার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। কারণ, অন্যেরা আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোনই কাজে আসবে না। তোমাকে পথ চলতে দেখে যদি তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করে তবে তাদের দিকে তাকানো যাবে না। কারণ, তাদের দিকে দৃষ্টি ফেললে; তারা তোমাকে ধরে ফেলবে এবং পথ আটকে দেবে।”

পরিশেষে বলতে চাই, মুজাহিদ এসব জামাতের হকপন্থী হওয়ার নিদর্শন অসংখ্য। অনুসন্ধান করে সেগুলো সংকলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই, সত্য প্রত্যাশী ব্যক্তির সামনে এই তাইফা আল মানসূরার কিছু গৌরবময় কীর্তি তুলে ধরা, যাতে তাঁদের সঠিক পথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে পারেন। যাতে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁরাই ওই তাইফা যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আর আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।

আমীরদের নির্দেশ শ্রবণ এবং আনুগত্য প্রদর্শন

তাওহীদবাদী হে ভাই আমার ! মুসলিমদের জামাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের অধীনে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর সর্বোচ্চ লক্ষ্য পূরণের জন্য আরো কিছু জরুরী কাজ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সেসব করণীয় বিষয়ের মাঝে অন্যতম দু'টি বিষয় হচ্ছে আমীরদের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশে আসমান-জমিন প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন করেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই জগতে সবকিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ শ্রবণ করে এবং তাঁর আনুগত্য করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমান জমিনের সেই আনুগত্য প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন-

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿فصلت: ١١﴾

'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম'।[১২১]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট ইবলিসকে আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান ও মর্যাদা দান করে ইবলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন আদমকে সেজদা করতে। কিন্তু ইবলিশের অহংকার ও আত্মগরিমা আল্লাহর নির্দেশে আনুগত্য প্রদর্শন করতে তাকে বাধা দেয়। ইবলিশ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। এতে চূড়ান্তভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহর রহমত থেকে সে বিতাড়িত হয়। এবং চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়।

---

[১২১] সূরা ফুসসিলাত; ৪১: ১১

কিন্তু বান্দাদেরকে পরীক্ষার এই অধ্যায় আল্লাহ এখানেই সমাপ্ত করেননি। বরং এর ক্রমধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষাস্বরূপ আদম আলাইহিস সালামকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু চিরশত্রু ইবলিশের প্ররোচনায় তার ছলচাতুরি বুঝতে না পেরে আদম আলাইহিস সালাম বৃক্ষের দিকে পা বাড়ান। সেই গাছের ফল খেয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। আর এখন বনী আদমকে পরীক্ষার এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে।

মানবতা যখন নিষ্পেষিত ছিল, অন্ধ জাহেলিয়াতের কাদায় যখন মনুষ্যত্ব গড়াগড়ি খাচ্ছিল, এমনই এক সময়ে মক্কা মুকাররমা উপকণ্ঠে ঐশী দীপ্তি চমকিয়ে উঠল। সেই দীপ্তি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ এমন আয়াতসমূহ, যা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। ঐশী সেই দীপ্তি অবতীর্ণ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূণ্যভূমি মদীনা-মুনাওয়ারাতে হিজরতের নির্দেশ দান করলেন। ঐশী জ্ঞান ভাণ্ডারের আলোকে সেখানে একটি মুসলিম সমাজের অভ্যুদয় ঘটল। জাহেলিয়াতের অন্ধকার হটিয়ে, মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে গোটা মানবতাকে মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসতে মদীনায় একটি নতুন প্রজন্মের জয়যাত্রা আরম্ভ হল। নববী আদর্শে আলোকিত সেই সমাজে মানব জীবন যাতে স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করে, তাই সমাজ ব্যবস্থাপনার জন্য বিধি-বিধান ও শরীয়ত একান্তই প্রয়োজন ছিল। অন্যদের কাছে মাথা নত করা এবং অন্য জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করা আরব জাতির সহজাত প্রবণতার অনুকূল নয়। তাই সদ্যভূমিষ্ঠ এই সমাজের সদস্যরা অন্য কারো শ্রবণ ও আনুগত্যে রাজি ছিলেন না।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব চরিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সম্যক অবগত। তখন ঐশী বিধি-বিধান সংবলিত আসমানী ওহী অবতীর্ণ হওয়া ছিল সময়ের এক অপরিহার্য দাবি। সেসব বিধি-বিধানের মধ্যে ছিল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং উলুল আমরের[১২২] আদেশ-নিষেধ শোনা ও মানার নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং উলুল আমর ব্যক্তিবর্গের আনুগত্যে মাঝে এমন এক বন্ধন সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা কখনোই

[১২২] উলামায়ে কেরাম ও শাসকবর্গ

ছিন্ন হবার নয়। যা সদাসর্বদা অটুট। অতএব, এটি খুবই জরুরি একটি বিষয়। শাসকবর্গের মাঝে সুস্পষ্ট কুফরী না দেখা পর্যন্ত এবং তাদের আদেশ পালন সাধ্যাতীত না হওয়া পর্যন্ত এ আনুগত্যের গণ্ডি থেকে কোনো মুসলিমের বের হবার সুযোগ নেই।

শ্রবণ ও আনুগত্য ওয়াজিব হবার দলীলসমূহ

দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে আল্লাহ যাকে দায়িত্ব দান করেছেন, মুসলিমদের যে কোনো বিষয়ে আল্লাহ যাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, সে ক্ষেত্রে ওই দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্দেশ শ্রবণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয়। এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের নৈকট্য লাভ করে। কারণ, উলুল আমরের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অন্যরূপ। একাধিক হাদীসে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। আল্লাহর নাফরমানি ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রে উলুল আমরের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত বিষয়ে কাজী ইয়াযসহ আরো অনেকের সূত্রে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

ইসলামে শ্রবণ ও আনুগত্যের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাবুল কারীমে তাওহীদবাদীদেরকে তাঁর আনুগত্য, তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং উলুল আমরের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء: ٥٩﴾

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রাসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত। অতঃপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার)

সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা’।[১২৩]

ইমাম কুরতুবী নিজ তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, “পূর্বের আয়াতে শাসকদেরকে সম্বোধন করে আমানত যথাযথভাবে আদায় করা এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই, এই আয়াতে প্রজাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা’আলা তাঁর নিজের আনুগত্যের নির্দেশ জানাচ্ছেন। আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। অতঃপর এ আয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ে আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্য করার নির্দেশ জারি করেন। অতঃপর, তৃতীয় পর্যায়ে শাসকবর্গের আনুগত্যের আদেশ দেন। উলুল আমর দ্বারা শাসকবর্গ উদ্দেশ্য হওয়ার এ বিষয়টি অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের এবং আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীদের মতামত। আহলে ইলমদের এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম তাবারী নিজ তাফসীর গ্রন্থে এমনটাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: “উলুল আমর তথা উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা তাঁর বান্দাদেরকে যাদের আনুগত্যের আদেশ করেছেন তাঁদের বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, তাঁদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসকবর্গ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফুক্বাহায়ে কেরাম। অন্য আরেকটি দল বলেছে, তাঁরা হচ্ছেন দ্বীনের বিজ্ঞ আহলে ইলম ব্যক্তিবর্গ।”

অতঃপর ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ উলুল আমর দ্বারা শাসকবর্গ হওয়ার মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহর আনুগত্য এবং মুসলিমদের কল্যাণের ক্ষেত্রে শাসকবর্গের আনুগত্য জরুরী মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে অধিকাংশ ফুক্বাহায়ে কেরাম ও মুফাসসিরীনে কেরাম এটিকেই অগ্রাধিকারযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ।”

[১২৩] সূরা আন-নিসা; ০৪: ৫৯

ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করার পর বলেন, "এটিও জায়েজ আছে যে, সকলেই উদ্দেশ্য হবেন। অর্থাৎ উক্ত আয়াত দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের পাশাপাশি যুদ্ধের আমীর সকলকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, শব্দটি তাঁদের সকলকেই শামিল করছে। আর তা এভাবে যে, শাসকবর্গ সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা এবং শত্রুর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উলুল আমর। আর উলামায়ে কেরাম শরীয়ত হেফাজত এবং জায়েজ-নাজায়েজ বিষয়ে উলুল আমর। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে তাঁদের আনুগত্যের এবং তাঁদের নির্দেশ মান্য করা আদেশ দিয়েছেন।"

এবার আসি সেসব হাদীসের আলোচনায়, যেগুলো মুসলিমদের কোনো বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং তাঁদের আনুগত্য করার অপরিহার্যতা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। শ্রবণ ও আনুগত্যের এই বিষয়টিকে মুসলিমদের নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তির নির্দেশ অমান্যের ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকে শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করে ইরশাদ করছেন-

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করছে, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আনুগত্য করছে। আর যে ব্যক্তি আমীরকে অমান্য করছে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই অমান্য করছে। ইমাম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে লড়াই করা হয় এবং যার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হয়। তিনি যদি তাকওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা

করেন, তবে এর দ্বারা তাঁর প্রতিদান লাভ হবে। আর যদি তিনি অন্যায় কিছু করেন, তবে এর দায়ভার তাঁকে নিতে হবে।" [১২৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও ইরশাদ করেন-

((اسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإِنِ استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كأَنَّ رأْسَهُ زَبِيبةٌ)) رواه البخاري .

"তোমরা শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো যদিও তোমাদের আমীর বানিয়ে দেওয়া হয় একজন আবিসিনীয় দাসকে যার মাথা দেখতে কিশমিশের মত।" [১২৫]

আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّقَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ

"আমার খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) আমাকে ওসিয়ত করেছেন, যেন আমি শ্রবণ ও আনুগত্য বজায় রাখি যদিও আমীর হন ত্রুটিপূর্ণ একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাস।" [১২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"একজন মুসলিমের জন্য পছন্দ-অপছন্দ সব বিষয়ে শ্রবণ ও আনুগত্য বজায় রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো গুনাহের নির্দেশ লাভ না করে। যদি গুনাহের নির্দেশ লাভ করে তখন কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।" [১২৭]

---

[১২৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৯৭

[১২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৭২৩
[১২৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৮৬১
[১২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৭২৫

হাফেজ ইবনে রজব 'জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম' গ্রন্থে বলেছেন, "শাসকের শ্রবণ ও আনুগত্যের মাঝে মুসলিমদের পার্থিব জীবনের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা জীবনযাত্রা কল্যাণমুখর হয়ে থাকে। এর দ্বারা বান্দারা তাদের দ্বীন প্রচার ও রবের ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুও এমনটাই বলেছেন । তিনি বলেন, 'সৎ হোক কিংবা অসৎ—একজন ইমাম বা নেতা ছাড়া কখনই মানুষের মাঝে কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। আমীর যদি পাপাচারী হয়, তবে মু'মিন ব্যক্তি তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের রবের ইবাদাত করবে। আর পাপাচারী ব্যক্তিকে তার মৃত্যু দিবসের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "উলুল আমর ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি উলুল আমরের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পদমর্যাদা ও সম্পদের লোভে তাঁদের আনুগত্য করবে এভাবে যে, তারা যদি তার স্বার্থ রক্ষা করে; তাহলে সে তাঁদের আনুগত্য করবে। আর যদি রক্ষা না করে; তবে তাদের অবাধ্যতা করবে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবীজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

« ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف ».

"তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কেয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এরা হলো: (১) ওই ব্যক্তি, মরুভূমিতে অবস্থানকালে যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে আর সে মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকৃতি জানায়; (২) ওই ব্যক্তি, যে

আসরের পর কারো কাছে কোনো পণ্য বিক্রি করার সময় আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, সে এই মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করেছে; আর অপর ব্যক্তিও তাকে সত্যায়ন করে, কিন্তু বাস্তবে সে মিথ্যাবাদী। (৩) আর হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে কোনো ইমামকে বাইয়াত দেয় কেবলই জাগতিক স্বার্থে। ইমাম যদি বাইয়াতের কারণে তাকে কিছু দান করেন তবে সে বাইয়াত রক্ষা করে আর যদি কিছু না দেন তবে সে বাইয়াত রক্ষা করে না।”[১২৮]

শরীয়তের এমনি আরও বহু দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রয়েছে। সবকিছু এখানে উল্লেখ করলে আমাদের আলোচনা শুধু দীর্ঘই হবে। এসব অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উলুল আমরের আনুগত্য শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। এটি এমন একটি ইবাদাত, যার দ্বারা বান্দা তার রবের নৈকট্য লাভ করে এবং অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়। এই আনুগত্যের দ্বারা মানুষ দ্বীনের মাঝে বিভেদ তৈরি না করা এবং মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত মুজাহিদ ভাইয়ের কর্তব্য হলো, এই ইবাদাতের স্বাদ আস্বাদন করতে চেষ্টা করা। এজন্য তাঁকে তাঁর আমীরের ডাকে সর্বদাই লাব্বাইক বলতে হবে। আর তাঁকে বুঝতে হবে, আমীরের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সকল অন্তরের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের ভেতরেই সকাল-সন্ধ্যা যাপন করছেন।

আমরা যে আনুগত্যের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভালো কাজে আনুগত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধের সীমানার ভেতরেই এই আনুগত্যের বিস্তৃতি। এছাড়া আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দেশিত বিষয় সাধ্যের অতিরিক্ত না হওয়াও একটি শর্ত। এর বাইরে কোনো শ্রবণ ও আনুগত্যের কথা নেই। আহলে ইলম ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত এমনই। একাধিক হাদীস থেকে আমরা এমনটাই জানতে পারি।

[১২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩১০

সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থে আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস এসেছে। এই হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দল পাঠালেন এবং আনসারদের ভেতর একজনকে তার আমীর নির্ধারণ করলেন। আর দলের লোকদেরকে আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করলেন। তো একবার দলের আমীর রাগান্বিত হয়ে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি’? লোকেরা বলল, ‘জি হ্যাঁ, দিয়েছেন’। তখন আমীর বললেন, ‘তোমরা কাঠ সংগ্রহ করে আনো’। তখন তারা কাঠ সংগ্রহ করে আনল। অতঃপর, আমীর তাদেরকে আগুন জ্বালাতে বললে তারা আগুন জ্বালাল। তখন আমীর বললেন, ‘এই আগুনে ঝাঁপ দাও। তখন লোকেরা চিন্তা করতে লাগল এবং একে অপরকে ধরে রাখল আর বলল, ‘আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি’। তারা এমনটাই করতে থাকল। এরই মধ্যে আগুন নিভে গেল। এদিকে আমীরের রাগ পড়ে গেল। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি ইরশাদ করেন, “তারা যদি আগুনে ঝাঁপ দিত, তবে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে পারত না। আনুগত্য তো কেবল ভালো কাজে।”[১২৯]

---

[১২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪০৮৫

খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, শাসকবর্গের আনুগত্য ওয়াজিব কেবলই ভালো কাজে। যেমন, যুদ্ধের জন্য বের হতে বলা হলে, বিভিন্ন ইবাদাত সংক্রান্ত এবং মুসলিম জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক কোনো নির্দেশ দেয়া হলে অকুন্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। তবে কোনো গুনাহের ব্যাপারে যদি শাসকের নির্দেশ আসে, যেমন অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি, তবে সেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের কোনো বৈধতা নেই। আনুগত্য তো কেবলই ভালো কাজে, খারাপ কাজে নয়। আর ভালো কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব বিষয় বৈধ। যত হাদীসে সাধারণভাবে উলুল আমরের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা আছে, সবগুলো হাদীসই এ বিষয়টি দ্বারা শর্তযুক্ত।”

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “হাদীসটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নফরমানী করে উলুল আমরের আনুগত্য করবে, সে গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তার অপারগতা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং অপরাধের গুনাহের দায় তাকে নিতেই হবে, যদিও এমন হয় যে, আমীরের নির্দেশ না পেলে সে কাজটি করত না। হাদীস থেকে এমনটাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তৌফিক-এর উৎস একমাত্র আল্লাহ!”

এ কারণেই প্রত্যেক অধীনস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো: আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারো আনুগত্য না করা। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাউকে সন্তুষ্ট করতে না চাওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারো আনুগত্য করবে, আল্লাহর কাছে তার অপারগতা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন কাজের কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম, স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করার কোন বৈধতা ইসলামে নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

ইজতিহাদী মাসআলা তথা গবেষণামূলক বিষয়াদিতে আমীরের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া জরুরি। এজাতীয় বিষয়াদিতে এই ব্যতিক্রম এজন্যই যে, এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো দ্ব্যর্থহীন অকাট্য বক্তব্য নেই। এর উদাহরণ হলো, এক ওয়াক্তে দুই ওয়াক্তের নামায আদায় করা বৈধ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি। এমনই আরো বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলো মতবিরোধপূর্ণ। 'আকীদায়ে তাহাবীর' ব্যাখ্যাকার এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, "কুরআন সুন্নাহ'র দ্ব্যর্থহীন প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য দ্বারা এবং পূর্বসূরী আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে একথা প্রমাণিত যে, উলুল আমর, নামাযের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের আমীর বা সেনাপতি, যাকাত উসুলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি— এঁদের গবেষণামূলক বিষয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁদের জন্য অধীনে থাকা লোকদের কথা শোনা জরুরী নয়। বরং সকলের কর্তব্য হল দায়িত্বশীলদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের সামনে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ করা। কারণ, একতা ও সংহতির কল্যাণ এবং বিভেদ ও মতানৈক্যের অকল্যাণ রোধ শাখাগত বিষয়াদি থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এমনিভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াদিতে দায়িত্বশীলের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করা জরুরী। যেমন কখন আক্রমণ করতে হবে; কখন সরে আসতে হবে; কখন সামনে অগ্রসর হতে হবে; আর কখন পিছু হটে যেতে হবে... ইত্যাদি। এমনিভাবে সমর শাস্ত্রীয় আরো বিভিন্ন বিষয় যেগুলো অভিজ্ঞতা, বাস্তব জ্ঞান ও অনুশীলনের দ্বারা অর্জিত হয়, সেগুলোতেও কমান্ডারদের কথা মেনে নিতে হবে। আর যদি সেক্ষেত্রে আমীরের কোন বিশেষ নির্দেশনা না থাকে, তবে এই অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে ইমাম জুওয়াইনি 'গিয়াসুল উমাম' গ্রন্থে বলেছেন, "যদি গবেষণামূলক বিষয়াদিতে ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকে, তবে এক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসার তেমন প্রয়োজন নেই। তাই প্রত্যেকেই নিজের পূর্বেকার মতামত ও মাযহাব আঁকড়ে ধরে রাখবে। আর চির অমীমাংসিত বিষয়াদিতে তখন বিবাদে লিপ্ত দুই ব্যক্তি ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্যের ভিত্তিতে মতপার্থক্যের ওপরই বহাল থাকবে।

একটি লক্ষণীয় বিষয়

অধীনস্থদের মধ্যে শ্রবণ ও আনুগত্য আছে কি-না তা বোঝার উপায় কী?

এটি ওই সময় ভালোভাবে বোঝা যায়, যখন আমীর লোকদের অপছন্দের কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেন। যেসব আদেশ পালন করা ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। যেগুলো ব্যক্তির ইচ্ছানুরূপ হয় না, আদিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা যেসব আদেশের অনুকূল থাকে না, সেসব নির্দেশ জারি করা হলেই বোঝা যায় কার আনুগত্য কতটুকু। এ কারণেই শ্রবণ ও আনুগত্যের নির্দেশ সংবলিত হাদীসগুলোতে সর্ব অবস্থার কথা বিবৃত হয়েছে। এবং বিশেষভাবে অনিচ্ছাকালের কথা আলোচিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইমাম মুসলিম, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

« عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»

رواه مسلم .

"সুযোগে-দুর্যোগে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এবং তোমার ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দানের বেলাতেও শ্রবণ ও আনুগত্য তোমার জন্য ওয়াজিব।" [১৩০]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেন, "উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কষ্টকর হলেও এবং মনের ইচ্ছা না থাকলেও উলুল আমরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ তা গুনাহের বিষয় না হয়। যদি কোনো গুনাহের বিষয় সামনে আসে, তখন শ্রবণ ও আনুগত্যের কোনো বৈধতা নেই। প্রাধান্য দান বলতে বোঝানো হয়েছে, তোমাদেরকে বঞ্চিত করে জাগতিক সুযোগ-সুবিধার একচেটিয়া অধিকার ও আত্মসাৎ। অর্থাৎ তোমরা শ্রবণ ও আনুগত্য করে যাও, যদিও আমীররা জাগতিক সুযোগ-সুবিধার একচেটিয়া অধিকার চর্চা করে এবং তোমাদের প্রাপ্য তোমাদেরকে বুঝিয়ে না দেয়। এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, শ্রবণ ও

---

[১৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৬০

আনুগত্য সর্বাবস্থায় জরুরি। আর তার কারণ হচ্ছে, মুসলিদের ঐক্য বা একতা। কারণ, মতানৈক্য দ্বীন দুনিয়া সবকিছুর জন্যই ক্ষতির কারণ।"

তাই স্বচ্ছলতার সময় যেমন তেমনি অসচ্ছলতার সময়ও শ্রবণ ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। ইচ্ছানুরূপ হলে যেমন, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমীরের কথা শুনতে হবে। ঠিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -র নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তির ন্যায় হতে হবে-

«طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ» رواه البخاري.

"সুসংবাদ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তার কেশরাজি ধুলোমলিন। তার চুল এলোমেলো আর পা দুটো ধুলোয় ধুসরিত। যদি সে পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকে, তবে সর্বতোভাবে সে দায়িত্ব পালন করে। আর যদি পান করানোর দায়িত্বে থাকে, তবে সে দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে আদায় করে। সে যদি অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। যদি কারো জন্য সুপারিশ করে তবে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।" [১৩১]

---

[১৩১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৩০

আমীরের অবাধ্যতার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবুল কারীমে আমীরের নির্দেশ অমান্য করার কিছু পরিণাম আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে মু'মিন বান্দাদের পরিণাম কী ঘটেছিল! ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো অবস্থাতেই নিজেদের অবস্থানস্থল ত্যাগ করা যাবে না। এই নির্দেশ অমান্য করে অবস্থানস্থল ত্যাগ করার কারণে কীভাবে নিশ্চিত বিজয় সত্ত্বেও মুসলিমরা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজদের আদেশ দিয়েছিলেন-

لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا

"তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। যদি দেখো আমরা তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছি তবুও না। যদি দেখো, তারা আমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তবুও আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তোমরা এখান থেকে সরবে না।" [১৩২]

এই যুদ্ধে মুসলিমদের উপর যে বিপর্যয় নেমে আসে, তা ছিল তীরন্দাজদের ওই দলটির রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করার ফলাফল। ওহুদের ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ

---

[১৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৮১৭

الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
﴿آل عمران: ١٥٢﴾

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (সাহায্যের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করেছেন, (যুদ্ধের প্রথম দিকে) তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল করে যাচ্ছিলে! পরে যখন তোমরা সাহস (ও মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রাসূলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, এমনকি আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (তথা আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরেও তোমরা তার কথা অমান্য করে চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (ঠিক তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, (অপর দিকে) তখনও তোমাদের কিছু লোক পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকল, অতপর আল্লাহ তা'আলা (এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, অতপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাফ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা (হামেশাই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান। [১৩৩]

ইমাম জাসসাস, 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, "উক্ত আয়াতে মতবিরোধ ও মতানৈক্য না করার শর্তে মুসলিমদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক বিজয় দানের প্রতিশ্রুতির কথা জানানো হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা যেমনটা বলেছেন ওহুদের দিনে ঠিক তাই ঘটেছে। মুসলিমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাঁরা শত্রুদলের অনেককে হত্যা করেছিলেন। এদিকে রাসূল ﷺ একদল তীরন্দাজকে একটি বিশেষ স্থানে জরুরী ভিত্তিতে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা কোথাও সরে না যায়। কিন্তু দলটি যখন মুশরিকদেরকে পরাজিত হতে দেখল, তখন রাসূলুল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা উক্ত স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এখন এখানে অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য দেখা দিল। তখন পেছন দিক থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ[১৩৪] তাঁদের ওপর হামলে পড়লেন।

[১৩৩] সুরা আলে ইমরান; ০৩: ১৫২
[১৩৪] তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।

মুশরিকরা বহু মুসলিমকে শহীদ করে দিল। এত কিছু হলো কেবল-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে”।

এ ঘটনা নবীজি ﷺ-এর নবুওয়াতের সত্যতার একটি প্রমাণ। কারণ, নির্দেশ অমান্য করার আগ পর্যন্ত মুসলিমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যরূপে দেখতে পেয়েছেন। অতঃপর যখন তাঁরা নির্দেশ অমান্য করলেন, তখন তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো।

এ ঘটনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। আর এই সাহায্য আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর আনুগত্য করার সঙ্গে সম্পর্কিত। শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম এমনই।

এই ঘটনায় অবাধ্যতা এবং নির্দেশ অমান্য করার পরিণতি বিষয়ে প্রতিটি মুসলিমের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। কারণ, অনেক সময় একজন ব্যক্তির নির্দেশ অমান্য করাটাই মুসলিমদের পরাজয়ের মৌলিক কারণ হয়ে থাকে। হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারি গ্রন্থে বলেছেন, “এই ঘটনায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কুফল দেখা গেছে। দেখা গেছে যে, এই কুফল যারা ওই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হননি, তাঁদেরকেও শামিল করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴿الأنفال: ٢٥﴾

‘তোমরা এমন ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকো যা তোমাদের মধ্য থেকে কেবল জালেমদেরকেই গ্রাস করবে এমন নয়’। [১৩৫]

---

[১৩৫] সুরা আনফাল; ০৮: ২৫

আমীরকে শ্রদ্ধা করা

খিলাফতে রাশেদার পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলিম ভাই; যিনি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে তৎপর মুসলিম জামাতের একজন সাধারণ সদস্য হতে ইচ্ছুক, তাঁর জন্য এ বিষয়টি জানা আবশ্যক। আমীরকে সম্মান করা, তাঁকে শ্রদ্ধা করা, তাঁকে সমীহ করা এবং তাঁর জন্য কল্যাণের দু'আ করা একটি প্রশংসনীয় বিষয়। একাধিক হাদীসে এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম গ্রন্থে আউফ ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ»، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ»

"হুমায়ের গোত্রের এক লোক শত্রুদলের একজনকে হত্যা করল। তখন লোকটি নিহত ব্যক্তির সালব[১৩৬] চাইল। তখন সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আবেদন খারিজ করে দিলেন। তখন আউফ ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ খালিদকে বললেন, 'কী কারণে তুমি তাকে তার প্রাপ্য সালব দিচ্ছ না'? খালিদ জবাব

[১৩৬] সামরিক সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় পাথেয়।

দিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে হল তা বেশি হয়ে যাচ্ছে’। তখন নবীজী বললেন, ‘তাকে ওসব দিয়ে দাও’। তখন খালিদ, আউফের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে আউফ তাঁর চাদর টেনে ধরে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে ফয়সালা আমি তোমাকে জানিয়েছি, তা সঠিক হলো তো’? রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন, ‘হে খালিদ তাকে তা দিও না... হে খালিদ! তাকে তা দিও না! তোমরা কি আমার আমীরদেরকে অবহেলা করছ? তোমাদের আর তাদের উদাহরণ তো ঐ লোকের মত যাকে উট অথবা বকরির দায়িত্ব দেয়া হলো আর সে সেগুলোকে মাঠে চড়াল। অতঃপর যখন পশুগুলোকে পানি পান করানোর সময় এল তখন লোকটি তাদেরকে একটি হাউজের কাছে নিয়ে গেল। তখন পশুগুলো হাউজের স্বচ্ছ পানি পান করল আর অপরিষ্কার পানি রেখে দিল। অতএব, সেই স্বচ্ছ পানি তোমাদের (মা’মুর) জন্য আর ময়লাযুক্ত পানি তাদের (আমীর) জন্য।” [১৩৭]

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আমীরদেরকে কতটা সম্মান করতেন! তাঁর আমীরগণ লাঞ্ছিত হবেন, অপদস্থ হবেন, এটা কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারতেন না।

পাঠক চিন্তা করে দেখুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন পন্থায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান রক্ষা করলেন! আর তা হচ্ছে এজন্যই যে, আমীরকে সম্মান করার মাঝে রয়েছে বিরাট কল্যাণ। ইমাম নববী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এমনটাই বলেছেন।

আল্লাহ ইমাম নববীর ওপর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করুন। তিনি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো বলেন, “প্রজাদের ভাগ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সহজ বিষয়গুলো জুটে থাকে। কোনো প্রকার কদর্যতার সংমিশ্রণ ছাড়াই তারা নিজেদের প্রাপ্যগুলো লাভ করে থাকে। আর কঠিন বিষয়গুলোর ভার বইতে হয় শাসকদেরকে। সঠিক নিয়মে সম্পদ সঞ্চয় করা, সঠিক নিয়মে সম্পদ ব্যয় করা, প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাদের জন্য স্নেহ অনুভব করা, তাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা—এই সবই শাসকদের দায়িত্ব। অতঃপর কখনো যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, কাউকে যদি তিরস্কার ভর্ৎসনা শুনতে হয়, সেটা শাসকদেরই শুনতে হয়, প্রজাদের নয়’।

---

[১৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৬৬৯

‘আওনুল মাবুদ’ গ্রন্থের প্রণেতা শামসুল হক আবাদি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, “তোমাদের জন্য আমি যাদেরকে আমীর নির্ধারণ করেছি—যাদের মাঝে রয়েছে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ— তাঁদের বিরোধিতা করে এবং তাঁদের অনুসরণ না করে তোমরা তাঁদেরকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারো? তোমাদের এমন আচরণ আমীরদের শানের উপযোগী নয়।”

ইমাম আহমদসহ অন্যরা মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন-

«خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَة، أَوْ خَرَجَ غَازِياً، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامه يُرِيدُ تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ»

“পাঁচটি এমন কাজ রয়েছে, কোনো ব্যক্তি তারমধ্যে কোনো একটি করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কাছে তাঁর প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে (১) যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল; (২) যে ব্যক্তি জানাযার সঙ্গে বের হলো; (৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য বের হলো; (৪) যে ব্যক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কোনো ইমাম বা রাষ্ট্রনায়কের কাছে গেল এবং (৫) যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বসে থাকল, আর এতে করে মানুষজন তার থেকে নিরাপদে থাকল আর সেও মানুষজন থেকে নিরাপদে থাকল”। [১৩৮]

নবীজি ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ) (رواه الطبراني والبيهقي)

[১৩৮] আল-মু‘জামুল কাবীর, হাদীস নং- ৫৫

“সুলতান হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর ছায়া। যে ব্যক্তি সুলতানকে সম্মান করল সে যেন আল্লাহ কে সম্মান করল। আর যে ব্যক্তি সুলতানকে অপমান করল সে যেন আল্লাহকে অপমান করল”।[১৩৯]

আবু বাকরা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস যেটাকে আলবানী হাসান বলেছেন, তাতে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সুলতানকে সম্মান করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাঁকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সুলতানকে অপমান করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে অপমানিত করবেন”।[১৪০]

তিরমিজির একটি বর্ণনায় এভাবে আছে-

من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب

‘যে ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ আল্লাহর সুলতানকে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। ইমাম তিরমিজি এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন, এটি হাদীসে হাসান গারীব’।[১৪১]

নবীজি ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

«إنَّ مِنْ إجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ» رواه أَبُو داود .

---

[১৩৯] শু‘আবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস নং-৭৩৭৩
[১৪০] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২০৪৩৩
[১৪১] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-২২২৪

"শুভ্রকেশ বিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের এমন ধারক-বাহককে সম্মান করা যে কুরআনের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেনি; আবার শিথিলতাও করেনি, আর ন্যায়পরায়ণ সুলতানকে সম্মান করা—এগুলো আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অন্তর্ভুক্ত"।[১৪২]

পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴿النساء: ٥٩﴾

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রাসূলের এবং সেসব লোকদের,যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত'। [১৪৩]

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর তাফসীরে বলেন, "সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা সুলতানকে এবং উলামায়ে কেরামকে সম্মান করবে। যদি তারা এই দুই শ্রেণীকে সম্মান করে, তবে আল্লাহ তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টিকে পরিশুদ্ধ করে দেবেন। আর যদি মানুষ এই দুই শ্রেণীকে অবহেলা করে, তবে আল্লাহ তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টিকে ধ্বংস করে দেবেন।"

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রবেশকারীকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে আমাদের পছন্দসই মত হল, যাদের ইলম, বুজুর্গী, আভিজাত্য, অথবা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত, তাঁদের বেলায় এমনটি করা মুস্তাহাব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে শ্রদ্ধা নিবেদন, সম্মান প্রদর্শন ও সৌজন্যমূলক আচরণ। লৌকিকতা কিংবা তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না। পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম এবং পরবর্তীদের আমল এমনই ছিল"।

আমীর এবং সুলতানকে সম্মান করার উপায় হলো: তাঁদের জন্য কল্যাণের দু'আ করা। তাঁদের সামনে বিশেষ করে জনসমক্ষে তাঁদের অপছন্দনীয় কোনো কাজ না করা। তাঁদের সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা না বলা। তাঁদের অগোচরে প্রয়োজনের সময়ে তাঁদের হিতাকাঙ্খী হওয়া। তাঁদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভীতি যাতে নষ্ট না

---

[১৪২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৪৫
[১৪৩] সূরা আন-নিসা; ০৪: ৫৯

হয়ে যায়, সেজন্য প্রকাশ্যে তাঁদেরকে কোনো কিছু করতে বারণ না করা। তবে কখনো যদি অবস্থা ও কল্যাণের দাবি এর ব্যতিক্রম হয়, তখন প্রকাশ্যে কোনোকিছু করতে বারণ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে যে আমানত দান করেছেন তার বোঝা বহন করতে তাঁদেরকে সাহায্য করা। গুনাহ ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা। অসতর্কতা ও অসচেতনতার সময়ে তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া। পদস্খলন বা ত্রুটি দেখতে পেলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। তাঁদের পক্ষে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা। তাঁদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এমন মানুষের মনে তাঁদের ব্যাপারে সু-ধারণা সৃষ্টি করে। উত্তম পন্থায় তাঁদেরকে অত্যাচার করা থেকে বাঁচিয়ে রাখা এজাতীয় আরো বিভিন্ন বিষয় যেগুলো পালন করা প্রশংসার দাবি রাখে।

আর উলুল আমরকে অপমান করা এবং তাঁদেরকে খাটো করা বিভিন্ন পন্থায় হয়ে থাকে। যেমন, অন্যদের সামনে তাঁদের নিন্দা করা, তাঁদের দোষ চর্চা করা, তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রচার করা। তাঁদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা, তাঁদের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া। মুসলিমদের যে বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছেন, সে বিষয়ে তাঁদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করা। প্রকাশ্যে তাঁদেরকে কোনোকিছু করতে বারণ করা; এজাতীয় আরো বিভিন্ন বিষয়, যেগুলো সাধারণভাবে অযাচিত ও নিন্দনীয় কাজ।

এ কারণেই আমীরকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মু'মিনদের জন্য একটি আবশ্যকীয় কাজ। এগুলো সাধারণভাবে সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা- এই দ্বীনকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা এবং মুজাহিদদের ঐক্য রক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচায়ক। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টারত প্রত্যেকের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়। যাতে অসতর্কতাবশত সাধারণ সাথীদের দ্বারা আমীরের অবাধ্যতার দরুন এমন কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না।

জামাতের মতাদর্শ ও লক্ষ্য আঁকড়ে ধরা, অবিচল থাকা এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা

জামাতের মতাদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আঁকড়ে ধরা খুব জরুরী একটি বিষয়। মুসলিম জামাতের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে জামাতের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি মুসলিম ভাইয়ের জন্য এ বিষয়টি ভালোভাবে জানা অত্যাবশ্যক। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেতে হলে এবং যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দলের কাঠামো নির্মিত হয়েছে, সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে হলে; এর কোনো বিকল্প নেই। এটি করা না হলে ভবিষ্যতে কাজের পরিণাম হবে ব্যর্থতা। শুধু ব্যর্থতাই নয়, বরং এর ক্ষতি সংক্রমিত হয়ে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। জামাত এমন একটি বিশৃঙ্খল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে যে, প্রতিটি সদস্য নিজের মন মত কাজ করবে। কোনো আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের তোয়াক্কা না করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা ও ধারণার অনুগমন করবে। এতে করে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। নানান চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব দেখা দেবে। পরিণতিতে হয় দল ভেঙে ফেলতে হবে অথবা বিভক্ত করে ফেলতে হবে[১৪৪] অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সদস্যদেরকে বহিষ্কার করতে হবে।

এ তো গেল এক দিকের কথা। অন্যদিকে মুসলিম জামাতের কর্ণধার ও নেতৃবৃন্দের জানা আবশ্যক যে, তাঁরা হচ্ছেন অন্যদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়। তাঁদের দিকে তাকিয়েই দলকে বিচার করা হবে। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার দ্বারাই মানুষ অনুপ্রাণিত হবে। যে আদর্শ তাঁরা প্রচার করেন, যে সত্যের দিকে তাঁরা মানুষকে আহ্বান করেন, তার ওপর তাঁদের অবিচলতা ও অটল অবস্থান দেখেই মানুষ উৎসাহ পাবে। তাঁদের কাজ ও আদর্শের মাঝে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তবে তার কুফল দলের সদস্য এবং অনুসারীদেরকে ভোগ করতে হবে।

[১৪৪] আর এক্ষেত্রে দলের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন, আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, লক্ষ্য বাস্তবায়ন না করে পিছু হটা থেকে সর্বতোভাবে নেতাদের নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিপদসঙ্কুল রক্ত পিচ্ছিল এই পথে কিছুতেই পিছলে পড়া চলবে না। তাঁদেরকে জেনে রাখতে হবে, উম্মাহ তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট এবং মুজাহাদার দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাঁদের ধৈর্যের দ্বারা মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার দ্বারা মানুষ সুপথপ্রাপ্ত হবে। তাঁদের অবিচলতা দেখে মানুষ আদর্শ শিখবে।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿السجدة: ٢٤﴾

'আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমারই আদেশে মানুষদের হেদায়াত করত,যখন তারা (অত্যাচারের সামনে কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা ছিল আমার আয়াতের ওপর একান্ত বিশ্বাসী'।[১৪৫]

প্রত্যেক দাঈ ব্যক্তির উচিত- এই বেদুইনের বক্তব্য থেকে শিক্ষা লাভ করা। মু'তাযিলাদের ফিতনার সময় ইমাম আহমদ বিন হানবলকে রাহিমাহুল্লাহ খলীফা মামুনের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল[১৪৬]। পথিমধ্যে বেদুইন জাবের ইবনে আমের তাঁকে বলেছিল, "শুনুন! আপনি হচ্ছেন মানুষদের প্রতিনিধি। তাই তাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবেন না। আপনি আজ মানুষদের নেতা। তাই ওরা আপনাকে যা করতে বলছে তা করার ব্যাপারে সাবধান! কারণ, যদি আপনি তাদের কথা মেনে নেন, তবে কেয়ামতের দিন তাদের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে। আর যদি আপনি আল্লাহকে ভালবেসে থাকেন, তবে যে আদর্শের ওপর আছেন তার ওপর টিকে থাকুন। কারণ, শুধু আপনার নিহত হওয়াটাই আপনার আর জান্নাতের মাঝে প্রাচীর হয়ে আছে। আর যদি আপনি এখন নিহত না হন, তবে একদিন তো মারা যাবেনই। যদি আপনি বেঁচে থাকেন, তবে তা হবে এক সম্মানজনক জীবন।"

ইমাম আহমদ বলেন, "এ বেদুইনের কথা ওদের বক্তব্য মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আমার মনোবল চাঙ্গা করে আমাকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তুলেছিল।"

---

[১৪৫] সূরা আস-সিজদাহ; ৩০: ২৪

[১৪৬] উদ্দেশ্য ছিল ইমাম আহমাদকে দিয়ে মু'তাযিলিদের খালকে কুরআনের কুফরী আকীদাহর পক্ষে বক্তব্য দেয়ানো অথবা তিনি অস্বীকার করলে তাঁকে শাস্তি দেয়া। - সম্পাদক

ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “জাতি গঠন হয় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমেই। সর্বোচ্চ গৌরবের প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিবর্গের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। যারা নিজেদের সমাজে হন অপরিচিত অবহেলিত। তাঁদের মত লোকদের কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও রিজিক দেয়া হয়।”

তিক্ত বাস্তবতার চাপ সহ্য করে আদর্শের ওপর টিকে থাকা এবং আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিকে যত ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, যত বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়, সবকিছুকে জয় করে মতাদর্শকে আঁকড়ে থাকা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে আদর্শের অনুগামী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন হলো: ইবাদতের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে প্রবৃত্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এবং গৌরবময় এই উম্মাহর পূর্বসূরীদের জীবনী থেকে আলো গ্রহণ করা। কারণ, জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও আদর্শের ওপর টিকে থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। জেল জুলুম ও দেশান্তরের মাধ্যমে নিজেদের দেহের ওপর অত্যাচার অবিচার সয়ে নিয়েও খুন রাঙ্গা পথে অবিচল থাকার অনুপম ইতিহাস তাঁরা রচনা করে গেছেন।

জামাতের দায়িত্ব হলো: সদস্যদেরকে আল্লাহর দ্বীন কেন্দ্রিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুশীলন করাবে। দলের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি পূজা/অন্ধভক্তি থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। অন্ধভাবে ব্যক্তি অনুসরণের পরিবর্তে মানহাজে রাব্বানী আঁকড়ে ধরার দীক্ষা দেবে। মতবাদ ও আদর্শকে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে মূলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে; তবেই সদস্যদের অন্তরে সেই আদর্শের বীজ বপন করবে। এতে সদস্যরাও ঠিক সেই উৎস থেকেই আলো গ্রহণ করতে পারবে, যা থেকে দলের নেতৃবৃন্দ আলো গ্রহণ করেছেন। অভিন্ন ঝর্ণাধারা থেকেই সদস্যরা স্বচ্ছ পানি পান করতে পারবে। যেহেতু অন্তরের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে; তিনি যখন চান তা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তাই কখনো নেতা পিছু হটে যেতে পারে, তাঁর শক্তি খর্ব হয়ে যেতে পারে, চিত্র পাল্টে যেতে পারে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সমাজ ও দলের ক্ষেত্রে এমন বাস্তবতা দেখা গেছে। তাই গভীর ঈমান এবং সঠিক উৎস থেকে সত্যকে জানা ও গ্রহণ করা, মতবাদ ও আদর্শের ওপর টিকে থাকার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। মানুষ দলে দলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে, দলে

দলে আদর্শ থেকে সরে আসলে, দলে দলে আদর্শ বিকিয়ে দিলেও, সত্যিকারের আদর্শবান ব্যক্তি তাতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করবে না।

অতীতে যারা এই দ্বীনের জন্য কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে বড় বড় যেসব ব্যক্তিত্বের পা আদর্শ ও সংগ্রামের পিচ্ছিল পথে হড়কে গেছে, তাদের ব্যাপারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তির বাস্তবসম্মত সঠিক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। তাই আমরা অতি সংক্ষিপ্তাকারে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতাদর্শ নিয়ে কিছু আলোচনা করব। এতে করে সংগ্রামী বন্ধুগণ আরও বুঝতে পারবেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘপথে যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য এবং একটি কাঙ্খিত ইসলামী সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য আদর্শের ওপর টিকে থাকা এবং কাজের বৈচিত্র্যময় কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা কতটা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তৌফিক দাতা!

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিচ্যুতি

উসমানী খিলাফতের সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে গেছে তখন মুসলিমদের খিলাফতের এই শূন্যস্থান পূরণে মুসলিম বিশ্বে অনেকগুলো ইসলামী দলের অভ্যুদয় ঘটে। অল্প দিনের ভেতরেই সেগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এসব দলের শীর্ষে রয়েছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুড। তারা সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অত্যন্ত উঁচু মাপের মতাদর্শ ও ভাবধারার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে, বাস্তবায়নে এবং কর্মী সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের মনে তা বদ্ধমূল করার ক্ষেত্রে দলটি প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে।

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সরল-সঠিক পথের অবলম্বন হিসেবে তারা তাদের মতাদর্শ বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে নিয়োজিত হয়। তারা ঘোষণা করে ওঠে, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমাধান—কুরআনই একমাত্র সংবিধান—জিহাদই একমাত্র পথ—শাহাদাতই হতে পারে সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা—খিলাফতে

রাশেদার প্রাসাদ পুনর্নির্মাণ শরীয়ত নির্দেশিত কর্তব্য—মানবজীবনে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই!

তখন উম্মাহর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে স্বপ্নচারী মুসলিম যুবকের সামনে এই জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ব্যতিরেকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার আর কোনো পথ ছিল না। মানবতার হারানো সিংহাসনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মতকে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সে লক্ষ্য পূরণ হওয়ার ছিল।

এভাবে সময় যেতে থাকে। একপর্যায়ে বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে এবং তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দলটি তাদের আদর্শ থেকে সরে যেতে শুরু করে। তাদের চির অম্লান দৃষ্টিভঙ্গি আর অমর মূল্যবোধগুলো শয়তানি রাজনীতি আর বহুমুখী ষড়যন্ত্রের কবলে একেবারে অন্তঃসারশূন্য নিস্তেজ হয়ে যায়। মাসলাহাত বা কল্যাণের এমন চোরাবালিতে তারা পতিত হয়, মনে হয় যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই কল্যাণকেই তারা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিপদ-আপদের মুখে ভেঙে পড়ে। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। শিরকী গণতন্ত্র নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত সত্য সঠিক মানহাজ বিরোধী বহু বাতিল পন্থার অনুসরণ করতে শুরু করে। যাই হোক, শাসন ক্ষমতা লাভ করে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আর ভাগ্যে জোটেনি[১৪৭]। আমরা এভাবে বলতে চাই—তারা যদিও এই সুযোগ লাভ করেনি, কিন্তু সোনালী অতীতের স্মৃতিচারণ তারা করে গেছে। পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের (রাহিমাহুমুল্লাহ) গৌরবময় কীর্তিমালার গান তারা গেয়ে গেছে।

দলটি যখন তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তখন এই বাস্তবতা অনুধাবনের অনিবার্য ফলাফলস্বরূপ অনেক যুবক —আমি নগণ্য তাদের একজন—

---

[১৪৭] লেখাটি ২০০৬-০৭ এর দিকে রচিত। পরবর্তীতে ২০১২ সালে আরব বসন্তের সময় তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসে। ২০১৪ সালে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাচ্যুত। একদিকে তারা আদর্শের সাথে আপস করলো, দ্বীনের মূলনীতিতে ছাড় দিয়ে গণতন্ত্র গ্রহণ করলো। সেক্যুলার সংবিধান দ্বারা শাসন করলো। অন্যদিকে এতো ছাড় দিয়েও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক, দুনিয়াবী বিচারেও তারা ব্যর্থ হলো। তারা যে পরিণতি এড়ানোর জন্য জিহাদ ও মুজাহিদিন থেকে দূরে ছিল, সেই পরিণতি ঠিকই তাদের খুঁজে নিলো। - সম্পাদক

চিন্তিতভাবে গোটা বিশ্ব জুড়ে অনুসন্ধানের দৃষ্টি বুলাতে থাকে। তাঁরা সেসব জামাত খুঁজতে থাকেন, যাদেরকে কখনো হতাশা স্পর্শ করে না। যাদের মাঝে আপস, পৃষ্ঠপ্রদর্শন, আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং নিজেদের চিন্তা চেতনা থেকে সরে আসার লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না। অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের পর সত্যসন্ধানী এসব যুবকের অন্তর সে সমস্ত লৌহমানবের দিকে ঝুঁকে যায়, ক্রুসেডাররা যাদের ভয়ে তটস্থ। মুরতাদ গোষ্ঠীর জন্য যারা মূর্তিমান আতঙ্ক। প্রলয়ংকারী ঝড়ের মাঝে যাদের অবস্থান অনড়। দেহমন উজাড় করে নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়নে যারা নিয়োগ করেন সর্বশক্তি। নিজেদের রক্ত দিয়ে যারা জীবন্ত আদর্শের চিত্র আঁকেন। যে মূল্যবোধ তাঁরা নিজেদের মাঝে ধারণ করেছেন, তার জন্য তাঁরা সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। ত্যাগ-তিতিক্ষার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখনো সে পথে অবিচল থাকা সে সব দল ও জামাত আর কোনটাই নয়, সেগুলো হচ্ছে জিহাদী দল ও জামাতগুলো। এগুলোর শীর্ষে রয়েছে জামাতে কায়েদাতুল জিহাদসহ এই মানহাজের অন্যান্য যেসব দল তাগুত গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব দল সালফে সালেহীনের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করছে। আপনজনেরা যখন তাঁদেরকে ফিরে আসতে বলছে, দূরের লোকেরা যখন তাঁদের কুৎসা রটাচ্ছে, গোটা জাহেলী ব্যবস্থা যখন একযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে, এমনই এক পরিস্থিতিতে তাঁদের চলার পথে সান্ত্বনা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী—

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٨﴾

"আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি

আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করে দাও । আর (বাতিলের মোকাবেলায়) তুমি আমাদের কদমগুলোকে মযবুত রাখো, হক ও বাতিলের (সম্মুখসমরে) কাফিরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই নেক বান্দাদের দুনিয়ার জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরষ্কার দিয়েছেন; আল্লাহ তা'আলা নেককার বান্দাদের ভালোবাসেন"।[১৪৮]

পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হলো, নীতি ও আদর্শের ওপর টিকে থাকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মুসলিম জামাতের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। জামাত যদি সত্যিই তার অনুসারীদের জন্য নমুনা হতে চায়, রবের দেয়া দায়িত্ব পালন করে যেতে চায় এবং ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে অবশ্যই আদর্শের ওপর টিকে থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া হয়, তাহলে পরিণতিতে ব্যর্থতা, বিনাশ আর বিলুপ্তি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আমাদের জানা থাকতে হবে যে, কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে, যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চিন্তা গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করে কোনো জামাত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে এর নজির নেই। শক্তিশালী কোনো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না থেকে; উদ্ভ্রান্তভাবে পথ চলে কোনো জামাত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এমন নজিরও নেই। বরং এমন জামাতের ধ্বংস অনিবার্য। এমন জামাত বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের মানসপটে উজ্জ্বল একটি ছবি আমরা এঁকে দিতে চাই। ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের সদস্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা জানাতে চাই। তা হলো, মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীতি-আদর্শের ওপর টিকে থাকা, সর্বাধিক উপযোগী পন্থা অবলম্বন করা, সবচাইতে কার্যকরী উপায় প্রয়োগ করা এমনই জরুরি একটি বিষয়, যার কোনো বিকল্প নেই। সর্বস্তরের লোকদের যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হলো, দুর্গম ও রক্ত পিচ্ছিল এই পথে রয়েছে অনেক বাধা বিপত্তি। রয়েছে নানান শঙ্কা আর ঝুঁকি। দাওয়াতের এই পথ চলা কোনো আনন্দ ভ্রমণ নয়। এটি কোনো মনভোলানো খেলা নয়, আর না কোনো শান্তিপূর্ণ কাব্যিক বিনোদন। এসব বিষয়ের উজ্জ্বল চিত্র যাতে সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের মানসপটে অঙ্কিত

---

[১৪৮] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১৪৬—১৪৮

হয়ে যায়, তাই আমাদের কর্তব্য হলো তানজিম কায়দাতুল জিহাদের মানহাজ ও দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করা। কারণ, এই জামাতটির নাম দিকে দিকে উচ্চারিত হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিপদ-আপদ সত্ত্বেও নীতি আদর্শের ওপর টিকে থাকার এই দৃষ্টান্ত, আল্লাহর তৌফিকে সত্য-সঠিক মানহাজ আঁকড়ে ধরে রাখার এই নমুনা এবং সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করার মত এই অনন্যসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে যেন সত্যসন্ধানী ব্যক্তির চেতনা পরিচিত হয়, সে লক্ষ্যেই আমাদের এই আলোচনা।

কল্যাণমুখী এই দাওয়াতের ঘোষণাকারী এবং এর পতাকা উত্তোলনকারী শাইখ মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ একটি সঠিক পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সাহায্য ও তৌফিকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সুদূরপ্রসারী কৌশল ও ধারাবাহিকতার কৌশল গ্রহণ করেছেন। সামনের আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ।

শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় এবং সাথীদের সহযোগিতায় দ্বীন ইসলামের সৈনিকদেরকে এক পতাকাতলে সমবেত করেছেন। রোমকদের উত্তরসূরী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই প্রচেষ্টায় অসাধারণ সহজতা ও সাফল্য দান করেছেন। মোবারক এই দাওয়াতটি যে ভিত্তি ও অমূল্য রত্নতুল্য মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলো মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসা মুরতাদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলনরত ব্যক্তিবর্গের রক্তভেজা অভিজ্ঞতা সম্ভারের সারনির্যাস ।

পুরানো বেদনার স্মৃতিচারণে শিক্ষার উপকরণ থাকে। তাই চলুন কিছুটা পেছনে ফিরে তাকানো যাক। এতে করে পাঠকবৃন্দ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত উক্ত পন্থাটি কতটা সরল-সঠিক, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন । এবং এই কৌশল নির্ণয় যে অন্তঃসারশূন্য ভিত্তিহীন কোনো কিছু নয়, তা বুঝতে সক্ষম হবেন। তারা আরো জানতে পারবেন, এই কর্মপন্থাটি একরাশ রক্তভেজা অমূল্য বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস। এর প্রথম চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল বিলাদুশ শাম তথা সিরিয়ায়। এর রক্ত-লাল খসড়া রচিত হয়েছিল, কেনানার ভূমি ও বহু কল্যাণের সমাবেশস্থল মিশরে। বিশ্বব্যাপী জিহাদী আন্দোলনগুলোর স্বপ্নদ্রষ্টা ও নেতৃবৃন্দ সুনিপুণ দক্ষতায় এই চিত্র এঁকেছিলেন। রক্তের হরফে তাঁরা খসড়া তৈরি করেছিলেন। মিশরের ভূমিতে এই

ব্যাপক কল্যাণের উচ্ছল ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল মহান শিক্ষক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের অবদানে। তারপর, এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন ডক্টর শহীদ সালেহ সারিইয়া। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, জামাতুল জিহাদ[১৪৯] এবং আল জামাআহ আল ইসলামিয়্যাহ তাঁদের দেখানো বিপ্লবের সুপ্রশস্ত রাজপথে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।

খিলাফতের পতনের পরের তিন দশকের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তিম সংগ্রামের পর বিপ্লবী যুবকদের কাছে[১৫০] একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মোবারক এই জিহাদের কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করা সহজ ব্যাপার নয় বিশেষ কিছু কারণে। এই কারণগুলো আমরা সুপ্রিয় পাঠকের বোঝার সহজার্থে পয়েন্ট আকারে নিম্নে তুলে ধরছি—

প্রথমত:

ভূপৃষ্ঠে শয়তানের সাম্রাজ্য আমেরিকা হচ্ছে ঐ সমস্ত মুরতাদ সরকার ব্যবস্থার মূল শিকড়, যেগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র তাওহীদবাদীদের বুকে চেপে বসে আছে। অর্থ, তথ্য ও সামরিক সাহায্য দিয়ে আমেরিকা মুরতাদ সরকারগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ইনশা আল্লাহ্, এই আমেরিকার কারণেই এসব মুরতাদ গোষ্ঠী লাঞ্ছনা, অভিশাপ ও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

দ্বিতীয়ত:

বর্তমান সময়ে কোনো একটি স্থানে তাওহীদের সৈনিকদেরকে সমবেত করা, এক পতাকাতলে তাঁদেরকে একত্রিত করা, একই কাতারে তাঁদেরকে শামিল করা, তাঁদের শক্তিগুলোকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করা—এ বিষয়গুলো একরকম অসম্ভব। কারণ, শত্রু তো আর বাইরের কেউ না। অর্থাৎ আসলি কাফের যেমন ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠী- কেবল তারাই তো এখন শত্রু নয়[১৫১]। তারাই একমাত্র শত্রু

---

[১৪৯] শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ'র পূর্বের জামাত

[১৫০] যাদের শীর্ষে রয়েছেন জিহাদী আন্দোলনের এক অমূল্য প্রতিভা মুজাহিদ শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি

[১৫১] মুসলিমদের মধ্যে মিশে থাকা মুসলিম নামধারী সেকুল্যার, মুনাফিক, তাগুত শাসকগোষ্ঠী, তাদের অধীনস্ত মুরতাদ বাহিনী ... ইত্যাদি অনেক শত্রু রয়েছে। -সম্পাদক

হলে ব্যাপারটা তেমন কঠিন ছিল না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মতের মাঝে কেউই এদের কুফরি ও এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফরজ দায়িত্বের ব্যাপারে সন্দিহান নয়। তবে, আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, যাদেরকে চেতনাগত অন্ধত্বে নিক্ষিপ্ত করেছেন, তারা ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে শত্রু না ভাবলে নাও ভাবতে পারে! আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা এমন অবস্থা থেকে আশ্রয় কামনা করি !

তৃতীয়ত:

মুসলিম জনসাধারণের বোধ-বুদ্ধি মুরতাদ গোষ্ঠীর ব্যাপারে ইসলামের হুকুম পুরোপুরি ধারণ করার উপযোগী নয়। রক্তপিপাসু এই মুরতাদ গোষ্ঠী আর তাদের সহযোগীদের কুফরীর ব্যাপারে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা এবং এদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করা একরকম অসম্ভব। বিশেষত: যখন আমরা জানতে পেরেছি, এ সমস্ত তাগুত গোষ্ঠী ভিক্ষুক ওলামা ও পেটুক ফকিহদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আত্মরক্ষা করছে। উপার্জনের ধান্দাবাজ এ সমস্ত আলিম শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন মূলপাঠ বিকৃত করতে এবং সেগুলোকে তার আসল অর্থ ও সঠিক মর্ম থেকে সরিয়ে আনতে ভীষণ পটু। প্রভুদের চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী তারা শরীয়তের বক্তব্যগুলোকে ব্যাখ্যা করে। প্রভুদের নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার ওপর তারা শরীয়তের লেবাস চড়াতে এ কাজ করে থাকে।

অপরদিকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ক্রুসেডার খ্রিস্টান এবং তাদের মিত্র অভিশপ্ত ইহুদিদেরকে টার্গেট বানানোর প্রশংসনীয় ফলাফল হাতে আসতে শুরু করেছে। পরিশ্রমের ফসল প্রায় পেকে গেছে। জিহাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আল্লাহর সাহায্যে প্রায় পুরোপুরি প্রস্তুত। এর কারণগুলোকে আমরা তিনটি পয়েন্টে ভাগ করব, যাতে সুহৃদ পাঠক খুব সহজেই তা বুঝতে পারেন-

প্রথম কারণ:

আসলি কাফের, যাদের কুফরীর বিষয়টা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে স্বতঃসিদ্ধ, তাদেরকে টার্গেট বানিয়ে ইসলামের সৈনিকদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, একীভূত করা, এক পতাকাতলে সমবেত করা এবং ন্যাক্কারজনক ক্রুসেড হামলার

মোকাবেলায় এক সারিতে দাঁড় করানো সম্ভবপর হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর থেকে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী ভাবাদর্শকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে ক্রুসেডার শক্তি যখন তৎপর, তখন তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের সৈন্যদল ঐক্যবদ্ধ।

দ্বিতীয় কারণ:

ক্রুসেডারদেরকে এবং তাদের মিত্র শক্তি কুকুর ও শুকরের বংশধর ইহুদি গোষ্ঠীকে টার্গেট বানানোতে রক্তপিপাসু মুরতাদ গোষ্ঠীর আসল চেহারা মুসলিম জনসাধারণের সামনে খুলে গিয়েছে। বিশেষত: মিডিয়ার মাধ্যমে এসব মুরতাদের দল তাদের প্রভু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য মাতম গাইতে শুরু করেছে। প্রভুদের দুঃখ-দুর্দশায় ভাগ বসিয়ে তারা ভারাক্রান্ত বিবৃতি দিতে আরম্ভ করেছে। তাদের নাপাক প্রভুদের নিকৃষ্ট স্বার্থবিরোধী তাওহীদবাদীদের যেকোনো বরকতময় সক্রিয়তায় তারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করেছে। এ অবস্থায় মুসলিম জনসাধারণের কাছে অনেক কিছু খোলাসা হয়ে গেছে।

তৃতীয় কারণ:

দরবারী আলেম আর পেটুক ইসলামী আলিমদের ধর্মহীনতা, আসল চরিত্র ও মুখোশ মুসলিম জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেছে। বিশেষত: তাদের প্রভু ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের যেকোনো মোবারক কাজ সম্পাদিত হওয়ার পর তারা টেলিভিশনের পর্দায় বিমর্ষ চেহারায় উপস্থিত হয়। নিহত ক্রুসেডার কীটগুলোর জন্য তারা হৃদয় সিঞ্চিত মায়া দেখাতে থাকে। শুধু তাই নয়, নিজেদের পথভ্রষ্টতা আর ভ্রান্তিতে আরও ডুবে গিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরসূরীদেরকে গালাগাল আর অভিশাপ দিতে থাকে। এমনকি তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যা দিতে থাকে। এগুলো দেখে মুসলিম জনসাধারণের বোঝার আর কিছুই বাকি থাকে না!

উপরোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখলে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর অনুসৃত মানহাজ বোঝা সহজ হবে। এই মানহাজের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে, পথভ্রষ্টতায় নিপতিত খ্রিস্টান এবং অভিশপ্ত ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একই সাথে তাদের লেজুড় মুরতাদ গোষ্ঠীর ব্যাপারে বেখবর না থাকা।

এ বিষয়ে কেউ আরো গভীরে যেতে চাইলে তাকে বলব, মুসলিমদের নিকট ও দূর অতীতের ইতিহাসে এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে, যা এই মানহাজের যথার্থতা ও উপযুক্ততা বুঝতে সহায়তা করবে। আফগানিস্তানের মহান ইমাম শহীদ আবদুল্লাহ্‌ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর অভিজ্ঞতা আমাদের সবার সামনেই রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ق: ٣٧﴾

‘এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে’।[১৫২]

[১৫২] সূরা কফ, ৫০: ৩৮

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ: প্রতিষ্ঠা লাভের কার্যকরী পন্থা

জিহাদ

এটি একটি মৌলিকভিত্তি। একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। ইসলামের চির অমর সুবিশাল বৃক্ষের গভীরে প্রোথিত শিকড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষ্য অনুযায়ী 'জিহাদ দ্বীনের শীর্ষ চূড়া'। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং সর্বাধিক প্রিয় আমল । এমনকি এটি ফরজ হয়ে গেলে অন্য কোনো আমল এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

জিহাদ।

মুসলিম গৌরবের প্রতীক। মুসলিম অস্তিত্বের প্রতিভূ। এটি এমন এক শক্তিশালী হাত, যা সীমালংঘনকারী অহংকারীদের রক্ত প্রবাহিত করেছে আর মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার পাষণ্ডদের শিকড় উৎপাটিত করেছে। যা জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, পথভ্রষ্টতার অগ্রপথিক উদভ্রান্তদের বখে যাওয়া অন্তরকে ভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করে সুস্পষ্ট হকের দিকে পথ নির্দেশ করে। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে কল্যাণ, হেদায়েত ও সুপথে পরিচালিত করে।

জিহাদ।

ইসলামের এক অমূল্য রত্ন। এর দ্বারা জাতি সঞ্জীবন লাভ করে। উন্নতি ও অগ্রগতির চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে। একে ছাড়া জাতি হয়ে যায় নির্জীব। জীবনের কোনো স্পন্দন থাকে না। হিংস্র হায়েনা আর কুকুরের দল তখন জাতিকে ছিঁড়ে খুবলে খায়।

জিহাদ।

নবী-রাসূলদের সীরাত। তাঁদের অনুসারীদের পথ। তাদের উত্তরসূরীদের আলামত। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যত মানুষ তাঁদের পথ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চায়, জিহাদ হলো তাঁদের সকলের আমল।

জিহাদ।

শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম-এর ভাষ্য অনুযায়ী 'গৌরবের উৎস, সম্মানের কষ্টিপাথর, স্বচ্ছতার ফোয়ারা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে উত্তরণে মানব জাতিসত্তার সহায়ক শক্তি।'

জিহাদের কথা উঠলেই তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে চলে আসে এর প্রথম কমান্ডার, মুজাহিদদের পথিকৃৎ ও আলোর পথের দিশারী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র নাম। তাঁর দীক্ষামূলক নিবিড় তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেছে নবী রাসূল আলাইহিমুস সালামদের পর ভূপৃষ্ঠে সর্বশ্রেষ্ঠ একদল মানুষ। ঐশী শিক্ষায় উজ্জীবিত অনন্যসাধারণ এই প্রজন্ম যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তারা কিসরার অগ্নি উপাসকদের দর্প চূর্ণ করেছেন। কায়সারের ক্রুশ ভক্তদেরকে ধ্বংস করেছেন। তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজা বাদশাদেরকে অপদস্থ করেছেন। শিরকের অনুসারীদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করেছেন। তাঁরা নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-মুজাহাদা, ন্যায়-নিষ্ঠা আর জিহাদের মাধ্যমে মানব গোষ্ঠীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা তাঁদের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকব। আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। আমরা তাঁদের পথের অনুসারী হব। আমরা তাঁদের পন্থার অনুগামী হব। এভাবে আমরা মানবজাতির সিংহাসনে আরোহণ করব। এবং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করব। আর না হয় এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে দেব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহর পথে জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত

জিহাদ ও শাহাদাতের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এ দুটোর প্রকৃত স্বাদ পাওয়া মানব মনে এমন কিছু স্মৃতি ও বেদনার অবতারণা হয়, যার উষ্ণতা ভাষায় প্রকাশ করা মোটেই সহজ নয়।

জিহাদ নবী-রাসূলদের সীরাত। তাদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের পথ ও পন্থা। শাহাদাত তো খোদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাঁর সৌভাগ্যবান সাহাবাদের পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়। সালফে সালেহীন এবং কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদের পথ ও পদাঙ্ক অনুসারী প্রত্যেকের আগ্রহের বস্তু।

কুরআনুল কারীম এ বিষয়ক ইলাহি রৌশনীতে ভরপুর, যা জিহাদের ফরজ দায়িত্ব পালনে মু'মিন বান্দার চেতনাকে উজ্জীবিত করে। এ সমস্ত ঐশী বাণী জান্নাতের উচ্চস্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মেহমান হবার উদগ্র বাসনা নিয়ে হত্যা ও শাহাদাতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে মু'মিনকে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে লড়াই ও হত্যার বিরাট প্রতিদান হিসেবে বিপুল পুরস্কার ও উত্তম আবাসস্থলের কথা জানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
﴿التوبة: ١١١﴾

'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর

আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা তাঁর সাথে করছ। আর এ হলো মহান সাফল্য।[১৫৩]

আল্লাহ তা'আলা বসে থাকা লোকদের ওপর সত্যের অনুসারী, তাওহীদের প্রতিরক্ষাকারী, মহৎপ্রাণ এ সমস্ত লৌহমানবদের প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন। তাঁদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে ইরশাদ করেন-

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النساء: ٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿النساء: ٩٦﴾

“মু'মিনদের মাঝে যারা কোনো রকম অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে – এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। (কিন্তু এটা ঠিক যে,) আল্লাহ মুজাহিদদের বসে থাকাদের ওপর অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়”। [১৫৪]

পক্ষান্তরে, কিছু লোক আছে, যারা ইহজগত ও তার চাকচিক্যকে আখিরাতের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। যারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশ, গোত্র ও পরিবারের ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর রাসূলের ভালবাসা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র চেয়ে প্রাধান্য দেয়। কেবল দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট

---

[১৫৩] সূরা আত-তওবা; ০৯: ১১১

[১৫৪] সূরা আন-নিসা; ০৪: ৯৫-৯৬

থাকে। তাদের ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿التوبة: ٢٤﴾

'বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় তোমরা করো এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না'। [১৫৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বশরীরে ২৮ টিরও অধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি যুদ্ধে তাঁর শিরস্ত্রাণ ভেঙে গেছে এবং তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয়েছে। তিনি ﷺ যুদ্ধ করে নিহত হয়ে আবার জীবিত হয়ে আবার পুনরায় যুদ্ধ করে নিহত হয়ে, আবার জীবিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধ করে নিহত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তিনি জিহাদের ব্যাপারে এতোটুকু অবহেলা করেননি। তিনি জিহাদের আলোচনা করতে এবং এ বিষয়ে লোকদেরকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে কখনোই পিছপা হতেন না। এমনকি মৃত্যুর সময়ও তিনি জিহাদের নির্দেশ দিয়ে বারবার বলছিলেন, "তোমরা উসামার বাহিনীকে পাঠিয়ে দাও।" নবীজি ﷺ-এর জন্য আমার পিতা ও মাতা উৎসর্গিত হোক!

জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলতের ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে, তার সবগুলো এই স্থানে উল্লেখ করা এবং সেগুলোর ব্যাপারে মন্তব্য পেশ করার সুযোগ নেই। তাই আমরা বাহারি এই নববী বাগিচা থেকে টকটকে লাল কিছু ফুল কুড়াব। ইনশা আল্লাহ সেগুলো চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবে, অনুভূতিকে জাগ্রত

---

[১৫৫] সূরা আত-তওবা; ০৯: ২৪

করবে এবং শাহাদাতের আশেক, তাওহীদের অনুসারীদের অন্তরে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত করবে। আর সেই আগ্রহ অনুপ্রেরণার পাখায় ভর করে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -র ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে সবান্ধবে বা একাকী হাজির হবেন। তাঁরা বুঝতে পারবেন, এই দ্বীন এবং ইসলামী সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন রক্ত ঝরানোর আর সব রকম ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার।আমাদের প্রত্যাশা এটিই।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

« قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ».

এক ব্যক্তি নবীজি ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'মানুষদের মধ্যে কে সর্বোত্তম'? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'এমন মু'মিন ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে'। তখন লোকটি বলল, 'অতঃপর কোন ব্যক্তি? তখন নবীজি বললেন, 'এমন মু'মিন ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোনো পাদদেশে অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দেয়'। [১৫৬]

ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়া বলেন, "নবুয়্যাতের স্তরের সবচেয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে আহলে ইলম ও আহলে জিহাদ। আহলে ইলম রাসূলদের আনীত বিষয়ে লোকদেরকে অবহিত করে। আর আহলে জিহাদ রাসূলদের আনীত বিষয় প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করে"।

ইবনে দাকিক আল ঈদ বলেন, "সাধারণ যুক্তির বিচার হলো: উপলক্ষ্যমূলক আমলসমূহের মাঝে জিহাদ সর্বোত্তম। কারণ, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসার, কুফরি প্রতিরোধ এবং তা দূর করার মাধ্যম হচ্ছে জিহাদ। তাই এসব বিষয়ের

---

[১৫৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৯৯৫

গুরুত্ব অনুপাতে জিহাদের গুরুত্ব অধিক হওয়াটাই সাধারণ যুক্তির বিচার। আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন!"

হাফেজ বলেন, "এটি মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য একটি সুস্পষ্ট ফজিলতের বিষয় যে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র সমপর্যায়ের আর কোনো আমল নেই।"

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন,

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ».

"জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেওয়া হয়। শহীদ পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে। শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পেয়ে সে আরো দশবার শহীদ হওয়ার কামনা করবে।"[১৫৭]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ : ((لاَ أَجِدُهُ)) ثُمَّ قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتقومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ)) ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟! .

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমপর্যায়ের হবে! তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আমি এমন কোনো আমল খুঁজে পাইনা'। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, 'তুমি কি এমনটা পারবে যে, মুজাহিদ যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে বিরামহীনভাবে নামায আদায় করবে এবং বিরামহীনভাবে রোযা রাখতে থাকবে?' তখন লোকটি বলল, 'এটা আবার কে পারবে"? [১৫৮]

[১৫৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯৭৬
[১৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৬৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯৭৭

ইমাম বুখারী বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ».

"জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতি দুইটি স্তরের মাঝে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন ফেরদৌস চাও। কারণ তা হলো জান্নাতের মধ্যভাগ এবং সর্বোচ্চ স্তর। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ আরো বলেছেন, 'তার ওপর রয়েছে রহমানের আরশ এবং জান্নাতের নদ-নদী তা থেকেই প্রবাহিত"। [১৫৯]

মাসরূক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

﴿آل‌عمران: ١٦٩﴾

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের রিযিক দেওয়া হচ্ছে'।[১৬০]

এ বিষয়ে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "তাদের রূহ একটি সবুজ পাখির ভেতর থাকে। আরশের সঙ্গে লটকে থাকা রুমালের মাঝে তা অবস্থান করে। তাঁরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়ান। অতঃপর সে সমস্ত রুমালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁদের রব তাঁদের প্রতি আরো অধিক

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৩৭
[১৬০] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১৬৯

মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কোনো কিছুর ইচ্ছা আছে'? তাঁরা বলেন, আর কিসের ইচ্ছা থাকবে, আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছি'? তখন আল্লাহ তা'আলা তিনবার তাঁদেরকে এভাবে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা যখন দেখেন, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাঁদেরকে ছাড়বেন না, তখন তারা বলেন, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দেহে আমাদের রূহ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আরেকবার আপনার পথে নিহত হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা যখন দেখেন- তাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই, তখন তাঁদেরকে ছেড়ে দেন।"

মিকদাম ইবনে মা'দিকারাব আল কিন্দি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

« إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكَمُ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِه ».

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে শহীদের জন্য বিশেষ কিছু মর্যাদা রয়েছে (এগুলো হচ্ছে) তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়ার আগেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। জান্নাতে তাঁর স্থান তাঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়। তাঁকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করানো হয়, কবরের আযাব থেকে তাঁকে পরিত্রাণ দেয়া হয় এবং মহাবিপদের ভয়াবহতা থেকে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়।তাঁর মাথায় সম্মানের এমন মুকুট পরানো হয়, যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং তদস্থলে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চাইতে উত্তম, ডাগর চোখ বিশিষ্ট ৭২ টি হুরকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়া হয়।

তাঁর আত্মীয় স্বজনের মাঝে ৭০ জনের ব্যাপারে তাঁকে মকবুল সুপারিশের অধিকার দেয়া হয়।”[১৬১]

আকীদাহ ও দ্বীনের বন্ধনে আবদ্ধ হে ভাই! আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে আগ্রহী হে মু’মিন! তুমি অগ্রসর হও। সত্যি যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে তুমি আন্তরিক হয়ে থাকো, তবে কোনকিছুর পরোয়া করো না। তোমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনে, জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মর্যাদা লাভে, মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতি নেয়ামত অর্জনে যদি তুমি ব্যাকুল হয়ে থাকো, তবে কারো কথায় কান দিও না।

[১৬১] মুসনাদে আহমাদ. হাদীস নং- ১৭১৮২

জিহাদ কেন প্রয়োজন?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদ করাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টারত তাওহীদবাদী বান্দাদের ওপর এই বিধানকে ফরজ করেছেন; একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে। তাওহীদবাদীদের জন্য সে প্রয়োজন ভুলে থাকার কোনো সুযোগ নেই। এই জিহাদ ব্যতীত আল্লাহর জমিনে কখনোই নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদাত হবে না। কখনোই আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ বিধান পরিত্যাগ করার ফলে জাহেলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, আর মানব প্রবৃত্তি শৃঙ্খলা মুক্ত হয়ে বিদ্রোহে লিপ্ত হবে।

তাওহীদবাদী এই উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে নিশ্চিতভাবে এটি স্পষ্ট হবে যে, জুলুম- নির্যাতন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ক্রুসেডারদের আগ্রাসন ইত্যাদি মিলিয়ে উম্মাহ্ যে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তা হলো ফরজে আইন এই বিধান পরিত্যাগের অনিবার্য পরিণতি। উম্মাহর বর্তমান এই অবস্থা জিহাদ ছেড়ে দেয়ার স্বাভাবিক কুফল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন-

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

'যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [১৬২]

ইবনুল আরাবী বলেন, "এই মর্মন্তুদ আযাব দেওয়া হবে দুনিয়াতে শত্রুর আগ্রাসনের মাধ্যমে আর আখিরাতে জাহান্নামের মাধ্যমে।"

[১৬২] সূরা আত-তওবা;০৯: ৩৯

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রত্যেকটি প্রজন্মের প্রতি এটি ঐশী সম্বোধন। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি নির্দেশিত জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং তার বদলে এমন লোকদেরকে আনবেন, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। আর এমনটাই হলো বাস্তবতা।"

আমরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য উদ্বুদ্ধ করি। আমরা এর দিকে আহ্বান করি। এই দায়িত্ব পালনকারীদের কাফেলায় যুক্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সৈনিক যুবকদেরকে অনুপ্রাণিত করি। এর পেছনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করে। তারমধ্যে কিছু হলো:

১) যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। কুরআনের আইন যেন বাস্তবায়িত হয়...

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, অতঃপর, যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তা'আলাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। [১৬৩]

সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "- وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ -[১৬৪] শুধু বিশেষ একযুগে নয়, বরং সর্বযুগে এটি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র সীমানা। মানবগোষ্ঠী তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সম্মান কখনই লাভ করতে পারে না। মানুষ পৃথিবীতে পুরোপুরি স্বাধীনতা

---

[১৬৩] সূরা আল-আনফাল; ০৮: ৩৯

[১৬৪] তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে।

কখনই লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহর সর্বময় শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বাদশাহর বিচার কার্যকর থাকবে না। মহৎ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মু'মিনদের দল লড়াই করে..."।

ইবনে জারীর তাবারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন, "অতএব, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ শিরক নির্মূল না হয়ে যায়, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত না করা হয়, ভূপৃষ্ঠ থেকে আল্লাহর বান্দাদের ওপর আপতিত এ বিপদ দূর না হয়। এবং সর্বময় শাসন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, সর্বপ্রকার ইবাদাত উপাসনা আর আরাধনা একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না হয় আর তিনি ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদাত বিলুপ্ত না হয়..."।

তলোয়ার ও জবানের দ্বারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করা না হলে ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এতে করে শিরক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কার্যকর হয়। আর এই দ্বীনের নিদর্শনাবলী ভূলুণ্ঠিত হয়। তবে কিছু ব্যতিক্রম ঘটলে তা আল্লাহর ইচ্ছায়।

২) জিহাদ ও আল্লাহর পথে বের হবার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পালনের জন্য...

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা বের হও স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।[১৬৫]

[১৬৫] সূরা আত- তাওবা;০৯: ৪১

ইমাম তাবারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন, “এ বিষয়ে দশটি মতামত রয়েছে। প্রথমটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তোমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পৃথকভাবে বের হও।

দ্বিতীয় মতামতটিও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত: উদ্যমতা না থাকুক বা থাকুক সর্বাবস্থায় তোমরা বের হও।

তৃতীয় মত: দারিদ্র সচ্ছলতা—সর্বাবস্থায় তোমরা বের হও। এমন মত দিয়েছেন মুফাসসির মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ।

চতুর্থ মত হচ্ছে: বার্ধক্যে হোক কিংবা যৌবনে...এটি বলেছেন মুফাসসির হাসান রাহিমাহুল্লাহ।

পঞ্চম মতামত হচ্ছে: অবসরে হোক কিংবা ব্যস্ততায়...এটি যায়েদ ইবনে আলী এবং হাকাম ইবনে উতাইবা'র বক্তব্য।

ষষ্ঠ বক্তব্য হচ্ছে: পরিবার-পরিজন থাকুক বা না থাকুক...এর প্রবক্তা হলেন যায়েদ ইবনে আসলাম।

সপ্তম মত হচ্ছে: পছন্দের সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক...এর প্রবক্তা হলেন ইবনে যায়েদ।

অষ্টম মত হচ্ছে: পায়ে হেঁটে হোক কিংবা ঘোড়ায় চড়ে...এর প্রবক্তা হলেন আওযায়ী।

নবম মতামত হচ্ছে: অগ্রগামী দলের সঙ্গে বের হও কিংবা মূল দলের সঙ্গে।

দশম মতামত হচ্ছে: বীরত্ব নিয়ে হোক কিংবা কাপুরুষতা নিয়ে...এটি বর্ণনা করেছেন নাককাশ। স

ব মিলিয়ে আয়াতের সাধারণ অর্থে সকল মানুষকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা বের হও, চাই বের হওয়াটা তোমাদের জন্য সহজ হোক কিংবা কঠিন।”

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢١٦﴾

‘তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়ত কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়ত বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [১৬৬]

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, “উক্ত আয়াত আল্লাহ কর্তৃক মুসলিমদের ওপর জিহাদ ওয়াজিব হবার ঘোষণা। অর্থাৎ তারা যেন শত্রুর অনিষ্ট থেকে ইসলামের সীমানাকে রক্ষা করে”। যুহরী বলেন, ‘একজন ব্যক্তি যুদ্ধ করুক কিংবা বসে থাকুক তার ওপর জিহাদ ওয়াজিব। বসে থাকা ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া হলে সাহায্য করা, সহযোগিতা করতে বলা হলে সহযোগিতা করা এবং বের হতে বলা হলে বের হওয়া ওয়াজিব। আর যদি তাকে প্রয়োজন না হয়, তবে সে বসে থাকবে। আমি বলব, এ কারণেই সহীহ হাদীসে এসেছে,

« من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات ميتةً جاهلية »

‘যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা করেনি, তবে সে এক প্রকার জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করল।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন,

«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

“(এই শহর) বিজিত হবার পর আর কোনো হিজরত নেই কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা বের হয়ে যাও।”[১৬৭]

---

[১৬৬] সূরা আল- বাকারা;০২: ২১৬
[১৬৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৬৩১

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, “জিহাদ বিমুখতা মুনাফিকদের চরিত্রের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

«مَنْ ماتَ ولم يغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نفْسَهُ بغزْوٍ مات على شُعْبَةٍ منَ نفاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের বাসনা করেনি, তবে সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।”[১৬৮]

ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল্লাহ তা’আলা সূরা বারাআ[১৬৯] নাযিল করেছেন, যার আরো একটি নাম হচ্ছে— 'فاضحة' যার অর্থ: লজ্জাজনক বা কলঙ্কজনক। কারণ হলো, এই সুরা মুনাফিকদেরকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ- ইরশাদ করেন-

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

“আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল', এবং যতক্ষণ সালাত কায়েম, যাকাত আদায়—এই কাজগুলো তারা না করে। যদি তারা এসব করে তবে ইসলামের খাতিরে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা আমার থেকে নিজেদের রক্ত (প্রাণ) ও সম্পদ নিরাপদ করে ফেলল। আর এমতাবস্থায় তাদের হিসাব একমাত্র আল্লাহ তা’আলার হাতে ন্যস্ত।”[১৭০]

---

[১৬৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৪০
[১৬৯] সূরা তাওবাহ
[১৭০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৫

জিহাদে সক্ষম প্রতিটি মুসলিমের ওপর বর্তমান যুগে জিহাদ ফরজে আইন। আল্লাহ্ তা’আলা যে ব্যক্তির শরীয়াসম্মত ওযর রয়েছে, সে ব্যতীত অন্য কেউ এই ফরজে আইন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। আমাদের আরও জানা উচিত যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আমল নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এমনটাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি লিখেন, “আর প্রতিরোধ যুদ্ধ, তা হচ্ছে নিজেদের সম্মান এবং আল্লাহর দ্বীন রক্ষার্থে শত্রুকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। অতএব, এটি সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। কারণ দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস করে দেয় যে আগ্রাসী শত্রু, ঈমান আনার পর এমন শত্রুকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কিছু নেই। এক্ষেত্রে কোন শর্ত প্রযোজ্য নয়। বরং সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের আলেমগণ এবং অন্যান্য সকলের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে”।

৩) পৃথিবীতে নির্যাতিতদের ওপর থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন দূর করার জন্য...

জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নির্যাতিত নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠী যাদের কোনো সাহায্যকারী অথবা অভিভাবক নেই, তাদের ওপর থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন দূর করা। আমরা সেসব দুর্বলদের কথা বলছি, প্রতিটি যুগে প্রতিটি স্থানে তাগুতগোষ্ঠী যাদেরকে নিজেদের দাসত্বের বন্ধনে আটকে রাখে। মুজাহিদীন ব্যতীত আর কারা আছে, যারা মজলুমদের ওপর নেমে আসা অন্যায় শাস্তির খড়গ আর দুর্যোগের মোকাবেলা করে?

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿النساء: ٧٥﴾

“আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জালিম জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের

জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও”।[১৭১]

ইমাম কুরতুবী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, “ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ -আর তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না?-এখানে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এই জিহাদ, কাফের মুশরিকদের হাত থেকে দুর্বলদেরকে নিষ্কৃতি দানের নিয়ামক। কাফের মুশরিকরা দুর্বলদের ওপর ন্যাক্কারজনক শাস্তির ভার চাপিয়ে থাকে। আর তাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই আল্লাহ তা’আলা তাঁর কালিমাকে উচ্চকিত করার জন্য, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে দুর্বল মু’মিনদেরকে রক্ষা করার জন্য জিহাদকে ওয়াজিব করেছেন, যদিও এতে প্রাণহানি রয়েছে। আর মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করা মুসলিম জামাতের ওপর ওয়াজিব। চাই সেটা লড়াই করে হোক কিংবা মুক্তিপণ দিয়ে। মুক্তিপণের বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়েছে; কারণ তা প্রাণের চাইতে তুচ্ছ। মালেক বলেন, 'মানুষদের ওপর ওয়াজিব, সমস্ত সম্পদ দিয়ে হলেও বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করা। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

فُكُّوا الْعَانِيَ

‘তোমরা বন্দি মুক্ত করো’।” [১৭২]

ইবনে নুহাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ইবনে আসাকির তালহা, ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে করিযের সূত্রে সংকলন করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘কাফেরদের হাত থেকে একজন মুসলিমকে আমি মুক্ত করব, এটা আরব উপত্যকার চেয়ে আমার কাছে বেশী প্রিয়।”

এইতো আমরা দেখতে পাই, খ্রিস্টানদের হাতে বন্দি এক মুসলিম নারীর আহ্বানে খলীফা মু‘তাসিম ৭০ হাজার সেনা সদস্যের একটি বাহিনী রওনা করিয়ে দিচ্ছেন!

---

[১৭১] সূরা আন-নিসা; ০৪: ৭৫

[১৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৮৮১

মুসলিম ওই নারীকে খ্রিস্টান এক পাষণ্ড চড় মেরেছিল। মুসলিম নারী তখন চিৎকার করে বলেছিলেন— 'কোথায় তুমি হে মু‘তাসিম?'

হে নবীর উত্তরাধিকারী দাবিদাররা! তোমরা কোথায় আছো? আজ ক্রুসেডারদের কারাগারগুলো এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ যুবকদের দিয়ে ভরে আছে। আর তোমরা আশ্চর্যরকম নিস্পৃহভাবে জিহাদকে হারাম বলে যাচ্ছ। আল্লাহর পথ থেকে তোমরা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ। এই দ্বীনকে সাহায্য করতে আগ্রহী ইসলামের সৈনিকদেরকে তোমরা পেছন থেকে টেনে ধরছ। তোমাদের কি ভয় হয় না, আকাশ থেকে যদি বিপদের বজ্র তোমাদের ওপর আছড়ে পড়ে? আল্লাহ তা’আলা যদি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আযাব দেন! তোমরা কি আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে ভয় করো না! দুর্ভোগ তোমাদের ! সময় ফুরোবার আগে তোমাদের বোধোদয় হোক! আল্লাহর কসম! এই জীবন তো অল্প কিছুদিন মাত্র, অতঃপর তোমাদেরকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে, আর তখন সব কিছুর যথার্থ প্রতিদান সামনে আসবে।

৪) আল্লাহর আযাব, তাঁর রাগ, ক্রোধ এবং প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভয়ের কারণে...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেন-

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿التوبة: ٣٩﴾

‘যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান’। [১৭৩]

শাইখ সাদী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন, “অতঃপর তিনি তাদেরকে বের না হওয়ার কারণে ধমক দিয়েছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন, ' إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا-যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে আযাব দেবেন।'-

[১৭৩] সূরা আত –তওবা; ০৯: ৩৯

দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। কারণ বের হতে বলা হলে বের না হওয়াটা এমন জঘন্য কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম, যেগুলোর কারণে কঠিন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। কারণ জিহাদে বের না হওয়ার মাঝে রয়েছে বহু রকম মারাত্মক ক্ষতি।

বসে থাকা ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করেছে। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে। সে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে অগ্রসর হয়নি। সে আল্লাহর কিতাব ও শরীয়তের প্রতিরক্ষা করেনি। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের দায়িত্ব পালনকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। অথচ আল্লাহর শত্রুদল তাদেরকেই মূলোচ্ছেদ করে ফেলতে চাচ্ছিল। তাদের দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছিল। বসে থাকা এ সমস্ত লোকদেরকে সাধারণত তারাই অনুসরণ করে যাদের ঈমান দুর্বল। শুধু বসে থাকাই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা জিহাদের ফরজ দায়িত্ব পালনকারীদের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়াটাই স্বাভাবিক। তাইতো তিনি ইরশাদ করছেন, ' إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا -যদি তোমরা বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন, আর অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'- কারণ তিনি তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা এবং তাঁর কালিমাকে উচ্চকিত করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাই তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করো কিংবা তা পেছনে ছুঁড়ে মারো, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। -' وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ -আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান'- ইচ্ছা পূরণে কেউ তাঁকে দমাতে পারে না, আর কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।”

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেছেন—' إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ -যদি তোমরা বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'

আযাব কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আবার কখনো তাঁর বান্দাদের হাতে হয়ে থাকে। মানুষ যখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তখন তিনি তাদেরকে এভাবে পরীক্ষায় ফেলেন যে, তাদের মাঝে পরস্পরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন। এমনকি এতে করে তাদের মাঝে ফিতনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর এমনটাই বাস্তবতা। কারণ, মানুষ যখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'য় মনোনিবেশ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে একীভূত করে দেন। তাদের মাঝে সদ্ভাব সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। আর তাদের সকলকে তাঁর শত্রু এবং তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। আর যদি তারা আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে আযাবে ফেলেন যে, তাদেরকে শতধা বিভক্ত করে দেন এবং তাদের এককে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করান।"

তিনি আরো বলেন, "এটি প্রতি প্রজন্মের প্রতি ঐশী সম্বোধন। এতে তিনি ঘোষণা করছেন, যে ব্যক্তি নির্দেশিত জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। আর তার স্থলে এমন কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। আর এমনটাই হলো বাস্তবতা।"

৫) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ জান্নাতের ফটকসমূহের মধ্যে একটি ফটক। জিহাদ এমন একটি মহৎ ইবাদাত , যার সমপর্যায়ের কোনো ইবাদাত নেই...

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النساء: ٩٥﴾

'গৃহে উপবিষ্ট মুসলিম-যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলিম যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে- এরা উভয়ে কখনো সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন বসে থাকা লোকদের তুলনায় এবং (জিহাদ তখনো ফরয না হওয়ায়) এদের প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন; (কিন্তু এটা ঠিক যে,) আল্লাহ

তা'আলা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মুজাহিদদের অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৭৪]

শাইখ সাদী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "মু'মিনদের মাঝে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করবে, আর যে ব্যক্তি এর জন্য বের হবে না, আর আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, (তারা কখনো সমান হতে পারে না)। এ আয়াতে জিহাদে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। শরীয়ত সঙ্গত ওযর ছাড়া জিহাদ না করে বসে থাকা এবং অলসতা করার ব্যাপারে হুমকি দেয়া হয়েছে। সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ, অন্ধ, খোঁড়া, পাথেয় বিহীন ব্যক্তি ওযর ছাড়া বসে থাকা লোকদের স্তরে নয়। তবে সমস্যায় জর্জরিতদের মধ্যে কেউ যদি বসে থাকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হলে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে বলে নিয়্যত না করে, এ বিষয়ে যদি সে আত্মজিজ্ঞাসা না করে, তবে সেও ওযর ছাড়া বসে থাকা লোকদের মাঝে গণ্য হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বসে থাকা লোকদের চেয়ে মুজাহিদদের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তি ও অগ্রাধিকার তুলে ধরছেন। এখানে প্রথমে অস্পষ্টভাবে তাদের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এরপরে সুস্পষ্টভাবে বিশদ আকারে তাঁদের মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন রহমত প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন, যা সর্বময় কল্যাণকে শামিল করে এবং সবরকম অনিষ্টকে প্রতিহত করে। সহীহাইনে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশদভাবে অনেকগুলো মর্যাদার কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, 'জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে: প্রতি দুটি স্তরের মাঝে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। এসব স্তরকে আল্লাহ মুজাহিদিন ফি সাবিলিল্লাহ্'র জন্য প্রস্তুত করেছেন।"[১৭৫]

সহীহ হাদীসে রয়েছে,

---

[১৭৪] সূরা আন-নিসা; ০৪: ৯৫
[১৭৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৩৭

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ : ((لاَ أَجِدُهُ)) ثُمَّ قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتقومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ)) ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟! .

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমপর্যায়ের হবে'! নবীজি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোন আমল পাইনা। তুমি কি পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয় তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে অবিরামভাবে নামায আদায় করবে এবং অবিরত রোযা রেখে যাবে?" তখন লোকটি বলল, 'কে আছে এটা পারবে'![১৭৬]

অন্য হাদীসে এসেছে,

« قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ».

বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল! মানুষদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তখন তিনি ﷺ বললেন, "এমন মু'মিন ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করে"।[১৭৭]

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

«لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

"আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।" [১৭৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কিতাব ও সুন্নাহ'য় জিহাদের নির্দেশ এবং এর ফজিলতের আলোচনা অসংখ্য,অগণিত। মানুষের নফল

[১৭৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৬৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯৭৭
[১৭৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৯৯৫
[১৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৯৮১

ইবাদতের মধ্যে জিহাদ সর্বোত্তম। জিহাদ উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে হজ ও ওমরা, নফল নামায এবং নফল রোযা থেকে শ্রেষ্ঠ। কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এমনটাই দেখা যায়।”

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, “অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে জিহাদের মতো সওয়াব ও ফজিলত বর্ণিত হয়নি। পর্যবেক্ষণ করলে এটি সুস্পষ্ট হবে। এর কারণ হচ্ছে, জিহাদের উপকারিতা আল্লাহর দ্বীন ও দুনিয়াবী ক্ষেত্রে মুজাহিদ এবং অন্যান্য সবার লাভ হয়। জিহাদ সর্বপ্রকার গোপন ও প্রকাশ্য ইবাদতের মিলনক্ষেত্র।”

৬) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়া ফিতনায় নিপতিত হওয়ার কারণ এবং তা নেফাকের আলামতসমূহের মধ্য থেকে একটি সুস্পষ্ট আলামত...

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ ﴿التوبة: ٤٥﴾

“নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দিহান হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে”।[১৭৯]

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন,

“কুরআনের সাক্ষ্য এবং দলিলের চাইতে আর কোন সাক্ষ্য অধিক সত্য হতে পারে? কোন দলীল অধিক শক্তিশালী হতে পারে? সুরা বারাআর এই আয়াতগুলোতে কুরআনে কারীম দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে, যে ব্যক্তি জিহাদের ডাকে সাড়া না দেবে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, নিজের পছন্দকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এই দ্বীনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য জান ও মাল দ্বারা জিহাদ না করবে, তবে সে ঐ সমস্ত লোকের মাঝে

[১৭৯] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ৪৫

গণ্য হবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। যাদের অন্তর সন্দিগ্ধ আর এর ফলে যারা সন্দেহের দোলাচলে আন্দোলিত হচ্ছে...।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী— "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ-আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং সর্বময় শাসন ও কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না হয়-প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি ফিতনার সৃষ্টির আশংকায় আল্লাহর নির্দেশিত লড়াই পরিত্যাগ করবে, নিজ অন্তরের রোগ এবং আত্মার ব্যাধির কারণে সে তো ফিতনার মাঝেই রয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে সে তো ফিতনায়-ই ডুবে আছে"।[১৮০]

অন্যত্র তিনি বলেন, "জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকদের চরিত্রের একটি (বৈশিষ্ট্য)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ ماتَ ولم يغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نفْسَهُ بغزْوٍ مات على شُعْبَةٍ منَ نفاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের বাসনা করেনি, তবে সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।" [১৮১]

অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ঈমানের ব্যাপারে সততার একটি শক্তিশালী আলামত। আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার একটি বড় নিদর্শন হল এই জিহাদ।

আর জিহাদ পরিত্যাগ করা, এ ব্যাপারে অলসতা করা নিফাকের একটি বড় আলামত। যা আত্মিক ব্যাধি ও ফিতনায় নিপতিত হবার কথা জানান দেয়।

---

[১৮০] অর্থাৎ জিহাদ করলে ফিতনা ফ্যাসাদ তৈরি হবে এই ভয়ে যারা জিহাদ পরিত্যাগ করে তারাই আসলে ফিতনার মধ্যে পড়ে গেছে। জিহাদ করা ফিতনা নয়। বরং জিহাদ না করাটাই ফিতনা। - সম্পাদক

[১৮১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৪০

৭) জিহাদ জাতি গঠন ও সমাজ নির্মাণের সর্বোত্তম পন্থা এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ…

এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কেউ সন্দেহ বা তর্ক করবে না যে, আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, নাম ও পরিচয় নির্বিশেষে এই মানব সভ্যতার ইতিহাসে যত জাতিগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, মানব সদস্যদের প্রচেষ্টায় যত সাম্রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করেছে, তারা লাশের স্তুপ, রক্তের সাগর আর রক্ত-মাংসের উপরেই সেই জাতি বা সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। রক্ত-মাংসের সেতুবন্ধনের সাহায্য তাদের রাজত্বের বাহন গৌরবের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছে। রক্ত সাগর পাড়ি দেয়া বিজয়ী দল পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন আর রাজদণ্ড করায়ত্তে এনেছে। এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা সরিয়ে রেখে পশ্চিমা খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীর কর্মপ্রণালী, ব্যবস্থাপনা, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন পর্যবেক্ষণ করা যাক।[১৮২]

আমরা দেখতে পাব তাদের বর্তমান অবস্থা দু'টি পক্ষের মাঝে সংঘটিত একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণতি। একটি পক্ষ হচ্ছে খ্রিস্টান চার্চগুলোর প্রভু দাবিদার যাজক গোষ্ঠী, যারা অত্র অঞ্চলের উদ্ভ্রান্ত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। আরেকটি পক্ষ হচ্ছে, যারা গির্জার শিক্ষাকে অস্বীকার করেছে, তার কথিত পবিত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে। পোপতান্ত্রিক চার্চগুলোর অন্ধ অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। আইন প্রণয়ন ও বিধান রচনার ক্ষেত্রে যাজকদের অধিকার কেড়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এসব অধিকারকে একমাত্র জনগণের হাতে ন্যস্ত করার দাবি উঠিয়েছে। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর, অনেক রক্ত ঝরানোর পর, অনেক প্রাণ বিসর্জন দেবার পর হতভাগ্য জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছে।

জি হ্যাঁ! এটাই হচ্ছে সেই রক্ত পিচ্ছিল পথ, যা খ্রিস্টান জনগণ বেছে নিয়েছিল। এভাবেই তাদের অলক্ষুণে হতভাগা সভ্যতার প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। এটাই সেই চড়া মূল্য, যা এ সমস্ত জাতিগোষ্ঠী পরিশোধ করেছিল, স্বাধীনতার শীর্ষ চূড়া ও মেকি গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহনের জন্য। এসব ধর্মহীন কাফির জাতি

---

[১৮২] এগুলোকে আমরা অস্বীকার করি, এগুলোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি এবং এগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অনুধাবন করতে পেরেছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াইয়ের ময়দানে বীর সেনানীদের শক্তি প্রদর্শন ছাড়া কখনোই জাতি গঠন হয় না, গৌরব অর্জিত হয় না।

আমাদের প্রিয় শাইখ মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আল্লাহর পথে লড়াই করা আমাদের দ্বীনের অবিভাজ্য একক। এটি আমাদের দ্বীনের পরমাণু। বরং এটি দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া। আর সর্বোচ্চ চূড়া বাদ দিয়ে দ্বীন কীভাবে বাকি থাকবে? আমাদের জাতীয় জীবন, আমাদের সম্মান ও গৌরব অবশিষ্ট রাখতে এটি অত্যাবশ্যকীয়। মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শত্রু, তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে সত্য কথাটাই বলেছে, ‘তুমি লড়াই করলে তবেই তোমার অস্তিত্ব থাকবে।’ এটাই হচ্ছে বাস্তবতা; যা তারা নিজেদের সন্তানদেরকে শেখাচ্ছে, আর আমাদেরকে তার বিপরীত বার্তা দিচ্ছে। এ কারণে সাধারণভাবেই লড়াই বড় বড় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। তোমরা চাইলে ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পারো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। মাত্র ছয় দশকের ভেতরে কতগুলো যুদ্ধের বহ্নিশিখা তারা জ্বালালো! কারণ একটাই, (তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য) এগুলোর প্রয়োজন ছিল। যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারাবিশ্বে যুদ্ধ বন্ধের আন্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, ওই দিনটি হবে তার পতন ও কর্তৃত্ব শূন্যতার সূচনা—এটা তারা ভালভাবেই জানে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় ওই দিনটি অচিরেই আসছে। তাই শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের নামে অস্ত্র পরিত্যাগের যেকোনো আহ্বানের ব্যাপারে সাবধান! কারণ প্রকৃত অর্থে তা হচ্ছে আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলার আহ্বান। মূর্খ অথবা মুনাফিক ছাড়া এজাতীয় দাওয়াতের পক্ষে কেউ যেতে পারে না”।

শাইখ মুজাহিদ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি 'আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ' নামক তাঁর অনবদ্য গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

“আল্লাহ তা’আলার দ্বীনে জিহাদের আকীদাহ পূর্ব থেকেই কুফর ও কাফের গোষ্ঠীকে উপর্যপুরি আক্রমণ করে এসেছে। আর এটা জানা কথা যে, সর্বাংশে কুফরিকে দুর্বল করে দেয়া এবং তার মূলোচ্ছেদ করা লড়াই ছাড়া সম্ভব নয়। প্রাণ বিসর্জন দেয়া এবং রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়া কোনো অবস্থায়ই কোনো দেশের

পক্ষে নিজেদের ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নয়। অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না, যাদের অনেকগুলো যুদ্ধের ইতিহাস নেই, শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মবিসর্জন আর শ্রেষ্ঠ যুবকদের রক্তদান যাদের ইতিহাসে নেই। পশ্চিমা বিশ্বের কথিত গণতন্ত্রের কথা শুনে প্রতারিত হওয়া যাবে না। কারণ মুসলিমরা যদি শাসন ক্ষমতা লাভ এবং শাসকবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে কিছুটা সহজতার কথা চিন্তা করে থাকেন তবে তা হবে এক জঘন্য ভুল। শাসন ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে জন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে বলে মনে করে থাকেন, আর এতে করে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এই পথ ধরে শাসন ক্ষমতা লাভ করা মুসলিমদের পক্ষে সম্ভব, তবে তা হবে এক জঘন্য বিভ্রাট। কারণ, এই সমস্ত শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার লোকদের এবং তাদের প্রতিপক্ষের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। সার্বভৌমত্বের অধিকারী এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যাকে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্র। এর অধীনে রয়েছে অনেকগুলো রাজ্য। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সুবিস্তৃত ভৌগোলিক সীমারেখার যে কাঠামোর ওপর এই রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে সংঘটিত সাংঘাতিক যুদ্ধের পরেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বগ্রাসী অনেকগুলো যুদ্ধ তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বিজয় লাভ করেছে। রাজনৈতিক এই পন্থায়ই পরাজিত দল আত্মসমর্পণ করেছে। এটাই বাস্তব দুনিয়ার চিত্র।

একইভাবে ইউরোপ এবং তার অধীনে যতগুলো রাষ্ট্র ও সরকার রয়েছে, তাদেরকে এই কাঠামোর ভেতরে আসার জন্য মহাদেশের ভেতরে এবং বাইরে অনেকগুলো যুদ্ধ লড়তে হয়েছে। সেসব যুদ্ধে প্রতিপক্ষ সর্বাত্মক শ্রম ব্যয় করেছে। এভাবেই কোনো একটা পক্ষ জয়লাভ করেছে, আর পরাজিত পক্ষ বর্তমান এই কাঠামো মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সর্বক্ষেত্রে বাস্তব দুনিয়ার চিত্র এমনই।

পশ্চিমা বিশ্ব অস্ত্রের সাহায্যে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের চিন্তাধারার বিস্তার ঘটাতে পারবে[১৮৩] আর তাদের প্রতিপক্ষের এই অধিকার থাকবে না। কেন? কেন এমন হবে? আমাদের মনে কেন এই প্রশ্ন আসছে না?

যারা চিন্তাধারার বিস্তার ঘটাতে এবং রাজনৈতিকভাবে চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, কিন্তু এর জন্য যুদ্ধবিগ্রহ এবং অস্ত্রের সাহায্যে শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করে না, কূটতার্কিক 'সাফসাতী' (sophists) দার্শনিকদের সাথেই তাদের মিল। কারণ, তাদের দাবি আর চেঁচামেচিগুলো হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য...!"

আমরা শাশ্বত গৌরবের মুসলিম উম্মাহ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। উম্মতে মুহাম্মাদির অধিকাংশের কাছে অবহেলিত এই ফরজ কাজকে পুনর্জীবিত করা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির সর্বোত্তম পন্থাগুলোর একটি। এটি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দের আমলগুলোর অন্যতম। তিনি এই আমলকারীকে বিশেষভাবে এমন মর্যাদা দান করেছেন, খুব কম মানুষই যা অর্জন করতে পারে। আসমানে এই আমল পালনকারীদেরকে এমন সুনাম ও প্রশংসার পাত্র বানিয়েছেন, খুব কম শ্রেণীর ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে। শেষ বিচার দিবসে তাঁদের জন্য তিনি সর্বোচ্চ মাকাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'কেয়ামতের পূর্বে আমি তরবারি সহকারে প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ না এক আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। আর আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়া তলে। আমার নীতির বিরোধিতাকারীর জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[১৮৪]

---

[১৮৩] ইউরোপ আমেরিকা যেমনটা করেছে

[১৮৪] মুসনাদে আহমাদ: ৫১১৪

রাব্বে কারীম তাঁর প্রিয় নবীকে এই যুদ্ধ বিষয়ে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। শিরক ধ্বংসের কার্যকরী সরল-সঠিক পথে চলার বিষয়টি তাঁকে এবং কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আসতে থাকা তাঁর সকল অনুসারী ও উত্তরসূরীকে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। হাত ধরে ধরে তাদেরকে সে পথে চলতে সাহায্য করেছেন, যে পথে চললে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿الأنفال: ٣٩﴾

‘তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা’আলার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, অতঃপর, যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তা’আলাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। [১৮৫]

---

[১৮৫] সূরা আল-আনফাল; ০৮: ৩৯

বর্তমান জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র প্রশ্নে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান

এই দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ ও বর্তমান সময়ে ইসলামের জন্য কাজ করা দলগুলো মধ্যকার ফাটল বেশ গভীর! ইসলামী দলসমূহ,তাদের অর্জন ও ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই এটি বোঝা যায়।

বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে অতি সংক্ষেপে আমরা কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। বর্তমান সময়ে ইসলামের জন্য কাজ করা এ সমস্ত দলগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির । কোনো কোনো জামাত জিহাদের একটি বিরাট অংশকে পুরোপুরি রহিত ও অকার্যকর করে দিয়েছে। জিহাদকে কেবল আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার মাঝেই একেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। সাইকস-পিকটসসহ অন্যান্য ক্রুসেডার প্রাচ্যবিদদেরা তাদেরকে যে সীমানা বেঁধে দিয়েছে, তাঁরা সেটার ভেতরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন: ইখওয়ানুল মুসলিমিন। তারা জিহাদকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এক দেশ, এক জাতি অথবা এক গোত্রের সীমারেখার ভেতর তারা একে আটকে ফেলেছে। আর তারা কেবল আগ্রাসী মূলগত কাফেরের বিরুদ্ধেই প্রতিরক্ষা যুদ্ধের বৈধতা দেখছে।

হামাস আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে। এর নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনের রক্ত আর ফিলিস্তিনি জাতীয়তাকে রক্ষা করার প্রবক্তা। ফিলিস্তিনিদের রক্ত এমনই পবিত্র রক্ত কোন অবস্থাতে যা ঝরানো বৈধ নয়। এমনকি যদি এই ‘নীল রক্তের’ মানুষ মুরতাদও হয়ে যায়—তবুও না।

এবার ইরাকের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। তাদের জন্য আফসোস হয়। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা যদি অন্তত ফিলিস্তিনের ইখওয়ানকে অনুসরণ করত, তাহলেও ভালো ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তারা ক্রুসেডারদের আগ্রাসনকে মেনে নিয়েছে। ক্রুসেডারদের হাতে হাত রেখে

অব্যাহত রক্তক্ষরণে সতেজতা ও উর্বরতা হারানো শুষ্ক এই ভূমিতে তারা শিরকী গণতন্ত্রের ধারক-বাহকদের একটি পক্ষে পরিণত হয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অধীনে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠিত জিহাদী আন্দোলনগুলো একটি জাতীয়তাবাদী স্বদেশ ভিত্তিক জিহাদে পরিণত হয়েছে। যেখানে একমাত্র প্রতিপক্ষ বহিরাগত আগ্রাসী কাফের। আর স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী যারা তাদের ও তাওহীদবাদীদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে, তাদের ব্যাপারে অবস্থান হলো, তারা পরস্পরে ভাই ভাই। তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সমস্ত মুরতাদরা ইখওয়ানের মতে বৈধ শাসক, কোনো অবস্থাতেই যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ নয়। বরং উচিত হলো: তাদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করা, উত্তম কথার মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দেয়া, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, তাদের সামনে নত হয়ে থাকা। এক্ষেত্রে তাদের পেছনে কাজ করে মুরতাদ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দেয়া 'নারীর' টোপ। একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা সমস্ত অভিযোগ দায়ের করি…।

সেসব জামাতের মধ্যে কোনো কোনোটি এমন রয়েছে, যারা জিহাদকে পুরোপুরি রহিত করে দেয়। তারা শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যকে মূল অর্থ থেকে সরিয়ে আনে। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো তারা সেগুলো বিকৃত করে। তারা উত্তম কথা, উত্তম উপদেশ, হেকমত, ধীরস্থিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের ভেতর জিহাদকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। তাদের কথা হচ্ছে, মানুষের আল্লাহবিমুখ দিলকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহমুখী করা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থাগুলোর মাঝে একটি। এই দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া এটি। তারা অন্যায়ভাবে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও অজ্ঞতাবশত দাবি করে, মুসলিমরা বর্তমানে মক্কী যুগে রয়েছে। তাদের মতে, তাওহীদ রক্ষার জন্য তরবারি কোষমুক্ত করে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া এখন মুসলিমদের জন্য উচিত নয়। কষ্ট সহ্য করা, নির্যাতন-নিপীড়ন ও সম্ভ্রমহানি মেনে নেয়া ছাড়া তাওহীদবাদীদের এখন আর কোনো কাজ নেই। এখন তাদের কাজ হচ্ছে প্রতিশ্রুত মাহদির অপেক্ষা করতে থাকা, যিনি নির্যাতিত উম্মাহর হাল ধরবেন, মুসলিমদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবেন এবং আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন!

সেসব জামাতের মাঝে কোনোটি আছে, যারা ন্যায়পরায়ণ শাসকের অস্তিত্বকে শর্ত ধরে নিয়েছে। তাদের মতে শিক্ষা-দীক্ষা, শরয়ী ইলম অর্জন, অতঃপর এর মধ্য দিয়ে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য আবু বকরের মতো ঈমান, ওমরের মত ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফ, ওসমানের মত লজ্জা, আলীর মত বীরত্ব, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের মত ফিকহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এগুলো অর্জন করা সর্বাগ্রে জরুরি। বর্তমানে মানব সমাজের ভেতর পূরণ হওয়া অসম্ভব এসব শর্ত তারা এতটাই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে যে, কোনো অবস্থায়ই যেন এগুলোর ব্যাপারে অবহেলা করা চলবে না। এমনকি অবহেলিত ফরজ জিহাদের কাজ আরম্ভ করা যাবে না; এ শর্তাবলী পূরণ হওয়ার আগ পর্যন্ত! দুঃখে কষ্টে যে বিষয়টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তা হলো, এ জাতীয় চিন্তাধারার অধিকাংশ তালিবুল ইলম নিজেদেরকে সালাফী বলে পরিচয় দেয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম!

এসব জামাতের মধ্যে কোনোটি জিহাদকে একেবারে অকার্যকর করে রেখেছে। তারা বিভিন্ন কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা, প্রচারমাধ্যম গড়ে তোলার কথা বলে জিহাদকে পাশ কাটিয়ে যায়। যেমন সাহওয়া সালাফী আন্দোলন। তাদের ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে ওয়াজিব জিহাদ হচ্ছে- বয়ান বক্তৃতার জিহাদ, উত্তম উপদেশের জিহাদ। অন্যকে বুঝতে পারা, উত্তম কথার মাধ্যমে পারস্পরিক মতবিনিময়, শাসকবর্গের মর্জিমাফিক বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া ইত্যাদি হলো বর্তমান সময়ের জিহাদের মূল কথা।

এসব জামাতের মধ্যে আবার কোনোটি এমন রয়েছে, যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদকে পুরোপুরি অকার্যকর মনে করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত এই বিধান; যা তিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য, দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য, ফিৎনা দমনের জন্য এবং তাওহীদ প্রচারের জন্য আমাদের শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন, শরীয়তসম্মত এই জিহাদী পন্থাকে তারা অন্যের কাছ থেকে নুসরাহ্ তলবের নীতি দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাদের আশা, বাইরের ওই শক্তিই তাদেরকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবে এবং রাজদন্ডের মালিক বানিয়ে দেবে। অবস্থা এমন, যেন রাজত্ব আর ক্ষমতা কোনো

সস্তা পণ্য। চাইলেই সেগুলো কেনাবেচা করা যায়! তারা আসলে ভুলে গেছে, রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় রক্ত ঝরানোর আর প্রাণ বিসর্জনের।

এসব জামাতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে, তাদের রুটিন ও কর্মবিধি খতিয়ে দেখলে এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদের কথাবার্তা ধারাবাহিকভাবে শুনে দেখলে, পাশাপাশি সত্য প্রাপ্তির আকুতি থাকলে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা খুব ভালোভাবে বুঝে আসে। আমরা যা কিছু লিখেছি, যা কিছু বর্ণনা করেছি, সেগুলোর প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে দিব্যদৃষ্টি অর্জিত হয়। তখন এই দ্বীনের গুরাবা দলের প্রথম ব্যক্তি, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীর সত্যতা অনুধাবন করা সম্ভব হয়-

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبى لِلْغُرَبَاءِ" رواه مسلم.

“ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় পথ চলতে শুরু করেছে আর অচিরেই তা পূর্বের অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ!” [১৮৬]

আমাদের শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ এমনই কিছু জামাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে খুব সুন্দর কথাই বলেছেন, “মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধনে অব্যাহতভাবে তৎপর রয়েছে। খোলাখুলিভাবে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে এখন তারা নতুন নীতি গ্রহণ করেছে। তারা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজে আইন বিধান থেকে মুসলিমদেরকে দূরে রাখার নীতি অবলম্বন করেছে। মুসলিম ঐক্য বিনষ্টের নানা মাধ্যম তারা গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে, চটকদার ও আকর্ষণীয় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে বিশেষ পদ্ধতির দাওয়াতে মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত দাওয়াতের মাঝে প্রধানত দুটো বিষয় থাকে:

প্রথমটি হলো: মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে আনা। আর তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার হাকিমিয়্যাহ্ বা বিধান প্রণয়নের একক অধিকারের সামনে আত্মসমর্পণ। এ সমস্ত

---

[১৮৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৯

দাওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ এই স্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দিয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাহেলী গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের আবহ তৈরি করা হয়। আর এর মূল কথা হলো, স্বতন্ত্রভাবে আইন প্রণয়ন মানব অধিকারভুক্ত; মানুষ নিজের খেয়াল খুশি মতো বিধানাবলী ও নীতিমালা প্রণয়ন করার অধিকার রাখে।

দ্বিতীয়টি হলো: মুসলিম বিশ্বের ওপর চেপে বসা এ সমস্ত মুরতাদ, শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরজে আইন জিহাদকে ভুলিয়ে দেয়। এমনকি এর পক্ষে কেউ কথা বললে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাদেরকে নির্বোধ মনে করে। তাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। তাদেরকে দমন করার জন্য সরকারকে আহ্বান করে। এমনকি এ সমস্ত তাগুত গোষ্ঠীর সামনে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে।

মুসলিমদের মাঝে ফাটল ধরাতে যে সমস্ত জামাত এজাতীয় দাওয়াতের কাজ করছে, তার মধ্যে রয়েছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। বিশেষত ৯/১১ এর ঘটনার পরের সময়ে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার, জাহিলি সংবিধানের বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরার ঘোষণায় সরব। অথচ এই সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর একক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। তারা মুসলিম যুবকদের আবেগ ব্যবহার করছে তাদেরকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর জন্য। শুধু তাই নয়, তারা এ সমস্ত যুবকের চেতনাকে পুঁজি করে নিজেদের স্থবিরতার মাঝে তাদেরকে টেনে আনছে। এবং তাগুত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদের ইসলামী চেতনাকে নির্বাচন ও সভা-সেমিনার মুখী করে দিচ্ছে।”

মুজাহিদ শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি এ সমস্ত জামাতের অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে বলেন, “মুসলিমরা যেহেতু মুরতাদ তাগুতকে অপসারণের ব্যাপারে একমত, তো কোন পন্থায় তাগুতকে সিংহাসনচ্যুত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে?

একশ্রেণীর মানুষ কেবল মানুষকে ইসলাম শিখিয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেন। এভাবেই নাকি ইসলামের শিকড় মজবুত হবে এবং মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। এর জন্য মুসলিমদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে হবে না। শুধু কি তাই? এই শ্রেণীর লোকদের সর্বোচ্চ চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে, তারা পুঁথিগত বিদ্যায় বড় বড় বিদ্বান হবেন, প্রতিভাবান রাজনীতিজ্ঞ হবেন, দিনে সিয়াম পালনকারী হবেন, রাতে সালাত আদায়কারী হবেন, এমনিভাবে কুরআন ও হাদীসের হাফেজ হবেন।

এই শ্রেণীর ভেতর এক মেরু সুফি ধারা থেকে বিপরীত মেরু সালাফী ধারা পর্যন্ত সব দিক রয়েছে, যার মাঝামাঝিতে আছে ইখওয়ান ধারা। তাদেরকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, ধরুন- তাগুতের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত, শক্ত-সমর্থ একশ' লোক আছে। এই বাহিনী ইলমে দ্বীনের বাহনগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে, বিদ্বান মহলের শাস্ত্রীয় নথিপত্র নষ্ট করে দিচ্ছে, ইবাদাতকারীদের তসবিহ ছিড়ে ফেলছে। মসজিদগুলো বিরান করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদাতপন্থীদের গোঁয়ার্তুমি ও সংকীর্ণ সুফীবাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি উক্ত বাহিনীর মোকাবেলায় জিহাদ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর কথা ভাবতে পারেন?"

বিলাসী জীবনে অভ্যস্তদের প্রতি আহ্বান

যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তারা পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ প্রবক্তার বাস্তব অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এসব মতবাদ প্রবক্তাদের মাথায় বুটিদার পাগড়ী, দেহজুড়ে সজ্জিত পোশাক, বিলাসিতার চাদর তাদের পুরো শরীরে, নরম বিছানার কোলে তারা রয়েছেন বিশ্রামের আবেশে। তাদের একেকজন সুউচ্চ প্রাসাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, ক্ষণিকের স্বপ্ন জগতে তাদের সার্বক্ষণিক বিচরণ। ইবলিসের প্রতারণায় নিজেদের আমল তাদের কাছে সুমহান কীর্তি। শয়তানের ধোঁকার ফাঁদে তাদের উদ্ভ্রান্ত চলাফেরা। মিছে সুখস্বপ্নে তারা বিভোর। শয়তানি ঔদাসীন্যে ডুবে থেকে শয়তানেরই দেখানো পথে তাদের এগিয়ে চলা। শয়তানের প্রণীত নীতি ঘিরে তাদের কর্মপরিকল্পনা, শয়তানি ভিত্তিপ্রস্তরের ওপরই তারা সুউচ্চ ইসলামী সমাজের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে মহা ব্যস্ত। কেউ যখন এসব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে দিশেহারা হয়ে যায়। অনুতাপ অনুশোচনায় ওই ব্যক্তি অশ্রু ঝরাতে থাকে। আর মর্মবেদনা নিয়ে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে এজাতীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের দুর্ভোগ হোক! তোমরা কি আল্লাহর কিতাব পাঠ করোনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত অনুসরণের প্রতিশ্রুতি কি তোমরা গ্রহণ করোনি! যুগে যুগে দাওয়াতের বিপ্লবী পথিকদের অবস্থা সম্পর্কে তোমরা কি অবগতি লাভ করোনি! ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধের ঘটনায় তোমাদের জন্য কি কোন শিক্ষা নেই!

হে আমার সম্প্রদায়! অচেতনার অলস নিদ্রা থেকে তোমরা জেগে ওঠো। উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে সচেতন হও। সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তবে শুনে রাখো, আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার এই পথ অতি দীর্ঘ, অতি দুর্গম আর কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে চলতে গিয়ে পথিক ভাষা হারিয়ে ফেলে। বর্শা-তরবারির ঝলক এ পথের মোড়ে মোড়ে। মৌখিক ভাষায় নয়, তলোয়ারের ভাষায় ঝংকৃত হয় মঞ্চ। গোলযোগের দরুন বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।

লড়াইয়ের ময়দানে রক্ত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মৃত্যুর দুয়ারে আছড়ে পড়ে মানব দেহ, আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই দুয়ারের আঙ্গিনায়। তিক্ত স্বাদের যন্ত্রণায় পথিকের দেহ নীল হয়ে ওঠে। বিপদ-আপদ আর দুর্যোগের বিষাক্ত দাঁত দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। অপরিচিতির রশি গলায় ফাঁস হয়ে বসে যায়। জি হ্যাঁ, এই হলো মানব নেতৃত্বের আসন পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের পথ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই হল কার্যকরী পন্থা।

জিহাদের পথে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ধৈর্য ধারণ

এটি অপরিবর্তনীয় এক ঐশী নীতি। বিশ্বপ্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম। দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালনকারীদের জন্য এমনটাই নির্ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়াল ।

যারা দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে চান, নবীজির রিসালাতের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন, অথবা স্বজাতির জন্য গৌরব অর্জন করতে চান, কোনো মতবাদের বিস্তার করতে চান অথবা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাদের পথ একটাই; যে পথ পাড়ি না দেয়ার কোনো বিকল্প নেই।

তা সুদীর্ঘ, দুর্গম, দুর্লঙ্ঘনীয় এমন এক পথ, যার সর্বত্র প্রবৃত্তি বিরোধিতার যাবতীয় উপকরণ। এর বাঁকে বাঁকে ক্লান্তি অবসাদের তীব্র রোদ্দুর। রক্ত-ঘামে সিক্ত এ পথের মাটি।

দুর্যোগ-দুর্বিপাকের এ এক দীর্ঘ অধ্যায়। কষ্ট যন্ত্রণার এ এক বিরাট কলেবর। এসবের মাঝেই লুকিয়ে আছে সম্মান ও গৌরব। এরই পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সুমহান দাওয়াতের কত রহস্য!

যুগ যুগের এ এক এমন সুদীর্ঘ সেতুবন্ধন, যা পাড়ি দিতে গিয়ে কেঁদেছিলেন নূহ নবী, অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ইব্রাহীম, করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলেন ইয়াহইয়া, জবাই হতে শুয়েছিলেন ইসমাঈল, অল্প কিছু দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছিলেন ইউসুফ এবং কাটিয়েছিলেন বন্দিশালায়, মিথ্যাচারের অপবাদ পেলেন আর কষ্ট স্বীকার করলেন লুত, জবাই হলেন সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া; ব্যাধি আক্রান্ত হয়ে কষ্ট সহ্য করলেন আইউব, মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পথ চললেন ঈসা, যারপরনাই কেঁদে গেলেন দাউদ, শত্রুতার শিকার হলেন মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর শিরস্ত্রাণ ভেঙে গেল এবং চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হলো। (আলাইহিমুস সালাম)

আল্লাহর কসম! এ পথে রয়েছে ক্লান্তি, বিপদ-আপদ, কষ্ট-মুসিবত আর ত্যাগ-তিতিক্ষা। যুগ যুগ ধরে অভিন্ন এই কাফেলার প্রথম সদস্য হলেন আদম আলাইহিস সালাম। কারণ, তাঁর সন্তানদের মাঝে তাওহীদবাদী রাসূলগণ সকলেই নিজেদের দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এমনই কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওই একই রকম কষ্টের বোঝা তাঁদেরকে বহন করতে হয়েছে। ওই তো মক্কার প্রাণকেন্দ্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ ﷺ কষ্টের জীবন পার করছেন। দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, হিংসা-বিদ্বেষ আর শত্রুতায় জর্জরিত হচ্ছেন। কারণ, তিনি তো ওই শ্রেণীর লোকদের পথিকৃৎ; যারা তাঁর পরেও দুর্গম পথের কষ্টকর যাত্রা অব্যাহত রাখবেন, আর তাঁদের মর্যাদা উন্নীত হতে থাকবে। যারা ঐশী দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কল্যাণের পথে, পুনর্গঠন ও সংশোধনের পথে মানুষকে আহ্বান করবেন। কিংবা কোনো অন্ধ জাহিলি শক্তিকে, প্রবৃত্তি পূজারীদের পছন্দের কোনো জীবনব্যবস্থাকে অথবা মানব সমাজের চরিত্রহীন শ্রেণীর পছন্দনীয় কোন উদ্ভ্রান্ত জীবনযাত্রাকে চ্যালেঞ্জ করবেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নির্যাতিত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “কুরআনে কারীমের প্রায় ৯০ টি স্থানে সবরের কথা বলা হয়েছে। উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে সবর করা ওয়াজিব। বরং এভাবে বলা যায়, সবর হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। কারণ, ঈমানের অর্ধেক হচ্ছে শোকর আর অর্ধেক হচ্ছে সবর। ইসলামের মধ্যে সবরের অবস্থান অনেক উঁচুতে। দেহের জন্য যেমন মাথা ঈমানের জন্য তেমনই সবর। যার সবর নেই; তার যেন ঈমানই নেই, যেমনিভাবে যার মাথা নেই; তার দেহের কোনো মূল্য নেই।”

উলামায়ে কেরাম সবরের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন: কষ্ট ও ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ। অভিযোগ না করে জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ।

সবর তিন প্রকার:

১. আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর করা;

২. আল্লাহর নাফরমানি বা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সবর করা;

৩. আল্লাহর দেয়া পরীক্ষার সময় সবর করা।

এই শেষ প্রকার তথা আল্লাহর দেয়া পরীক্ষার সময় সবর করা—এটিই যুগে যুগে দাওয়াতের কাণ্ডারি ও নবীর রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীদের সঙ্গী ছিল। একইভাবে রাসূলদের উত্তরসূরীদেরকে এবং মানবতার মুক্তির দিশারীদেরকে বিভিন্ন বিপদের সময় এই সবরেরই অনুশীলন করতে হয়েছে।

যেহেতু বিপদাপদে সবর করা, দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে দুর্বিনীত অহংকারীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে ধৈর্যধারণ করা রাসূলদের সীরাত এবং কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আসতে থাকা তাঁদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের বৈশিষ্ট্য, তাই কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে কুরআন অবতীর্ণকারী রব মানব চরিত্রের খুঁটিনাটি ও রহস্য সম্পর্কে, দাওয়াতের দুর্লঙ্ঘনীয় পথ ও কষ্টকর যাত্রা সম্পর্কে, দুর্গম এই পথের কাঁটা বিছানো একেকটি মঞ্জিল সম্পর্কে অধিক অবগত। তাই কুরআনুল কারীম এ বিষয়ে রবের নির্দেশনায় ভরপুর। সেসব দেখে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীরা রক্তস্নাত এ পথে সবর করতে এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে অনুপ্রাণিত হন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿البقرة: ١٥٣﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন”।[১৮৭]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿آل عمران: ٢٠٠﴾

[১৮৭] সূরা বাকারা; ০২: ১৫৩

‘হে ঈমানদানগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (ধৈর্যের এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (শত্রুর মোকাবেলায়) দৃঢ়তা অবলম্বন করো।একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো, (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে”! [১৮৮]

অন্য এক জায়গায় তিনি ইরশাদ করেন-

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴿البقرة: ١٥٥﴾

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের”।[১৮৯]

কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি একটি দীর্ঘ নির্জন পথ। কিন্তু এই পথে চলার প্রতিদান বিরাট। এ পথের পথিকদের প্রাপ্তি বিশাল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পাতায় পাতায় যে পুরস্কারের কথা জ্বলজ্বল করছে, তা দেখে যে কারো পক্ষে মৃত্যুর দুয়ারে আঘাত হানা সম্ভব। সেসব প্রতিদানের কথা ভাবলে বর্শা আর তরবারির ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার যৌক্তিকতা ধরা পড়ে।

নিশ্চয়ই! আপনারা যারা নিজেদের দ্বীনের পথে অবিচল, যারা এই দ্বীনকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছেন, নিজেদের মতাদর্শের ওপর অটল রয়েছেন, নিজেদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে পার্থিব জগতকে তুচ্ছ করেছেন; আপনাদের যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেবল এটাই, রবের সন্তুষ্টি অর্জন করবেন এবং তাঁর জান্নাতে চিরস্থায়ী আবাস লাভ করে তাঁর নৈকট্য পেয়ে ধন্য হবেন—আপনারা এখন থেকেই সুসংবাদ গ্রহণ করুন!

নিশ্চয়ই! প্রতিটি মু’মিন দলের, সত্যের দাওয়াতি মিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে; এমন প্রতিটি ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, বিপদ-আপদ সহ্য করা, দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মোকাবেলা করা, ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করা প্রতিটি হকপন্থী দাওয়াতি মিশনের

---

[১৮৮] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ২০০
[১৮৯] সূরা আল-বাকারা; ০২: ১৫৫

ললাটের লিখন। এর কোনো বিকল্প নেই এবং এ থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। আর কীভাবে এর কোনো বিকল্প থাকতে পারে, অথচ কুরআন আমাদেরকে অতীত দাওয়াতি মিশনগুলোর খুন রাঙ্গা পথের ঘটনা শোনাচ্ছে? অতীত যুগের পুণ্যবান লোকদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার কথা বর্ণনা করছে। আল্লাহর পথের সে সমস্ত পথিক যারা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তার শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী, বাস্তব জগতে কার্যকরভাবে তাঁর মানহাজ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে উদগ্রীব—কুরআন সে সমস্ত মহামানবের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে তুলে ধরছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾

‘তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্নাতে চলে যাবে, (অথচ) পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীদের (বিপদের) মত কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি। তাদের ওপর (বহু) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তা’আলার সাহায্য কবে আসবে? তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।[১৯০]

কি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট সম্বোধন! মু’মিন দলের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কোনো অস্পষ্টতাই রাখা হয়নি। আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানের আশায় যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ে নিয়োজিত, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা যাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাঁদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এর চাইতে উত্তম সম্বোধন আর কি হতে পারে?

[১৯০] সূরা আল বাকারা; ০২: ২১৪

এ এক এমন সম্বোধন, যার মধ্য দিয়ে আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরের দুয়ারে করাঘাত করছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে যেন তিনি তাঁর পথের পথিকদের কাঁধে হাত রেখে সাহস যোগাচ্ছেন। তাওহীদবাদী বান্দাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। রাসূলদের অজ্ঞাত অপরিচিত অনুসারীদেরকে আশ্বস্ত করছেন। যখন জাহেলিয়াতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দাওয়াতি সূর্য আচ্ছন্ন করে রেখেছে, জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা দাওয়াতের প্রথম সারির সংগ্রামী সাধকদেরকে দমিয়ে রেখেছে, তখন তিনি প্রিয় বান্দাদের দিকে রহমতের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াতটি প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক মহা সম্বোধন, যা তাওহীদবাদীদের দেহের ওপর ধৈর্যের মৃদু শীতল পরশ বুলিয়ে দেয়। জাহেলিয়াতের হিংস্র পশুগুলোর দন্ত নখর মু'মিন বান্দাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। বিপদ ও কষ্টের উদ্যত থাবা সেগুলোকে রক্তাক্ত করে তুলছে এবং কষ্ট ও যন্ত্রণা তাঁদেরকে কম্পিত করে তুলছে। এমন অবস্থায় দয়ার সাগর আল্লাহর উপরোক্ত সম্বোধন প্রিয় বান্দাদের জন্য যেন ব্যথার উপশম।

উপরোক্ত আয়াতটির মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলদের অনুসারীদের জন্য পথের মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন, যাতে করে জীবন পথের আঁকাবাঁকা গলি ঘুপচিতে তাঁদের বাহন হারিয়ে না যায়। প্রবৃত্তির উপর্যুপরি স্রোতে তাদের চিন্তার তরী যাতে ডুবে না যায়। পৃথিবীর সর্বত্র ফিৎনার এই প্রবল প্লাবনে তাঁরা যেন পথ ভুলে না যান। তাঁরা যেন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, বিপদ-আপদ সহ্য না করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাঁরা যেন বুঝতে পারেন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার না করে জান্নাতের পথ পাওয়া যাবে না। অনিদ্রার সুরমা চোখে না মেখে এবং কাঁটার বিছানায় না শুয়ে বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাবে না।

আবু মুসআব যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হচ্ছে, নিজ বান্দাকে বিপদ-আপদ দেওয়া, তাঁদেরকে পরীক্ষা করা, বাতিল ও বাতিলপন্থীদেরকে অদৃষ্টের লিখন হিসেবে সত্য ও সত্যপন্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿الأنعام: ١١٢﴾

'আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য (যুগে যুগে কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি মানুষের মাঝ থেকে, (কিছু আবার) জ্বিনদের মাঝ থেকে, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার মালিক চাইলে তারা (অবশ্য এটা) করত না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক'! [১৯১]

এটি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, যা কোনোভাবেই পরিবর্তিত হবার নয়। যারা এই দ্বীনের হাতল আঁকড়ে ধরবে, পৃথিবীতে এর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে, তাঁদেরকে অবশ্যই আল্লাহর এই পরীক্ষার একটা অংশ ভোগ করতে হবে। শত্রুদের শত্রুতার একটা অংশ অবশ্যই তাঁদেরকে নিতে হবে।

এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলা ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের এই উক্তিতে, "যারাই আপনার মত পয়গাম নিয়ে এসেছেন তারাই শত্রুতার শিকার হয়েছেন।" অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথে এবং তাঁর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চায়, তাঁদের আদর্শের দাওয়াত প্রচার করতে চায়, তাঁকে অবশ্যই বাতিল ও বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে নিজ অবস্থা এবং আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচলতা অনুপাতে কিছুটা হলেও শত্রুতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এই শত্রুতার মূল কার্যকারণ হচ্ছে, সত্যপন্থীরা যদিও দুর্বল অবস্থা ও সীমাবদ্ধতার ভেতর বসবাস করেন, তবুও বাতিলপন্থীরা যখন তাঁদেরকে দেখতে পায়, তখন পুনরায় তাদের ভুল নিজেদের সামনে ফুটে ওঠে। এতে করে তাদের উল্লাস বন্ধ হয়ে যায়। প্রবৃত্তির পিছনে তাদের যাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তারা তখন নিজেদের বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়। নিজেদের দুর্বলতা, মেকি ক্ষমতা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিজেরদের চোখেই দেখতে পায়। তারা তো আগে থেকেই নিজেদের খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির লাঞ্ছিত অপদস্থ দাসে পরিণত হয় বসে আছে।"

[১৯১] সূরা আনআম; ০৬: ১১২

বিপদ আপদ, জয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের কার্যকরী পন্থা

আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর প্রজ্ঞার দাবি হলো মানব সমাজের স্থিতি দুটি পক্ষের চলমান লড়াইয়ের ওপর নির্ভর করবে। একটি পক্ষে থাকবে সত্যপন্থীরা। তাঁরা হলেন রাসূলগণ, তাঁদের অনুসারী ও উত্তরসূরীরা। আরেকটি পক্ষে থাকবে বাতিলপন্থীরা, যাদের নেতৃত্বে রয়েছে অভিশপ্ত ইবলিশ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবুল কারীমে এই সত্যটিকে অতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿البقرة: ٢٥١﴾

'আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়"।[১৯২]

ঐশী এই বাণী সন্দেহাতীতভাবে একথা আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, বহমান কাল থেকে চলে আসা প্রাকৃতিক এই অমোঘ নীতির বাইরে গিয়ে মানব জীবন টিকতে পারে না। আর সেই অমোঘ নীতি হচ্ছে- হক ও বাতিলের লড়াই। কল্যাণ ও অকল্যাণের সংগ্রাম।

তাই, যারাই হকের দাওয়াতি মিশনে নামবে, রিসালাতের পয়গাম প্রচার ও আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে, তাঁদের সামনে অনিবার্যভাবে জাহেলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে সদলবলে শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা, দাওয়াত প্রচারক ও মু'মিন দলের পথে তাদের তল্পিবাহকদের সাহায্যে কালো পাথরের বাঁধ নির্মাণ করবে। কারণ, মু'মিন দল রবের তাবলীগকে নিজেদের কাজ বানিয়েছে, জাহেলিয়াতের সামনে তাঁরা বুক

[১৯২] সূরা আল –বাকারা; ০২: ২৫১

চিতিতে দাঁড়িয়ে গেছে, জাহেলিয়াতের প্রচলিত রীতিনীতি অস্বীকার করেছে। প্রভু দাবিদার মিথ্যাচারী লোকদেরকে ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। তাদের অপসৃয়মান আধিপত্য চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার মিশনে নেমেছে। তাদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করে মানুষকে ব্যক্তি পূজা, খেয়াল খুশি, খাহেশাত ও প্রবৃত্তি এবং আল্লাহর অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ কারীদের বাতিল নিয়ম-নীতি থেকে বের করে আনার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাঁরা তুচ্ছ ধ্বংসশীল জাহেলী সংঘকে প্রতিহত করে মানুষকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের আলো ও ঈমানের উজ্জলতায় উঠিয়ে আনার মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গীকার করেছে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বের স্তর হিসেবে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য একটি মু'মিন দলের প্রয়োজন। এই মু'মিনদের দল এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। মানুষের মাঝে ইলাহি পয়গাম প্রচারে মনোনিবেশ করবে। মানুষকে সত্যের পথে ডাকবে। এমনকি ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের প্রচেষ্টা ও কার্যকরী পন্থা গ্রহণের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করবে। বস্তুত: ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম এমনই। তাই এর পাল্টা জবাব হিসেবে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আকারে যৌথভাবে জাহেলি শক্তি জেগে ওঠা রব্বানী কাফেলার পথ রোধ করতে নিজেদের শত্রুতার তরবারি চালনায় মেতে উঠবে। সহায় সম্বলহীন অল্পসংখ্যক লোকের বরকতময় কাফেলাকে জন্মলগ্নেই পিষে ফেলার জন্য রাত দিন তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকবে।

তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে জাহেলি শক্তির চক্রান্তের কয়েকটি স্তর

প্রথম স্তর: অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা

রব্বানী কাফেলার বাহন অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহেলিয়াতের ভীড় ভেঙে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। এরফলে দুর্গন্ধময় জাহেলিয়াতের পঁচা পানির মিশ্রণে বিকৃত মানব মন-মস্তিষ্কের উপর হকের দাওয়াতের প্রভাব পড়তে শুরু করে। এমন অবস্থায় হঠাৎ হক বাতিলের মধ্যকার চিরন্তন রক্তাক্ত সংগ্রামের এক একটি অধ্যায়ের চিত্র ভেসে উঠতে আরম্ভ করে। বিপদ যেন কথা বলতে শুরু করে। বর্ণিত হয় কষ্টকর যাত্রার তিক্ত অভিজ্ঞতা সংবলিত রক্তাক্ত উপাখ্যান। সময়ের আকাশে নেমে আসে বিপদের ঘনঘটা। দুর্যোগের নেকড়েগুলোর হিংস্র থাবা মানবতার মুক্তির পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার মিশনে নিয়োজিত অটল অবিচল ধৈর্যশীল দলটির দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করতে আরম্ভ করে।

কুরআনুল কারীম শক্তিশালী কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে মু'মিন দলের প্রথম সংগ্রামের চিত্রগুলোর চিত্তাকর্ষক ছবি এঁকে দিয়েছে। মু'মিন দল ও তার প্রধান ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য কুরাইশদের চক্রান্তমূলক জাহেলী প্রচারণার বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। সত্যের দিশা দানকারী মহামানবের চিত্র বিকৃত করতে এবং তাঁর দাওয়াতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য জাহেলি শক্তি যে পন্থার আশ্রয় নিয়েছে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ ﴿الحجر: ٦﴾

‘তারা বলে, ওহে- যার ওপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে- তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি’। [১৯৩]

তিনি আরও ইরশাদ করেন-

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿الإسراء: ٤٧﴾

‘আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কান পেতে (কি কথা) শোনে (আমি এও জানি), যখন এই যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্থ লোকেরই অনুসরণ করে চলেছ’। [১৯৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আরও বলেন,

بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿الأنبياء: ٥﴾

‘ তারা তো বরং (কুরআনের ব্যাপারে) বলে,এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্নমাত্র, সে নিজেই এসব উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, সে (নবী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) এমন সব নিদর্শন নিয়ে আসুক, যা দিয়ে পূর্ববর্তীদের পাঠানো হয়েছিল’। [১৯৫]

আল্লাহ তা’আলা আরও ইরশাদ করছেন-

أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿الفرقان: ٨﴾

---

[১৯৩] সূরা আল-হিজর; ১৫: ০৬
[১৯৪] সূরা আল-ইসরা; ১৭: ৪৭
[১৯৫] সূরা আল-আম্বিয়া; ২১: ০৫

‘কিংবা (গায়েব থেকে) তার কাছে কোনো ধনভান্ডার এসে পড়ল না কেন, অথবা (কমপক্ষে) তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকত, যা থেকে সে (খাবার সংগ্রহ করে) খেতো; এ যালেম লোকেরা (মুসলিমদের আরও) বলে, তোমরা তো (আসলে) একজন যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ’।[১৯৬]

একইভাবে ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿سبإ: ٤٣﴾

“যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদাত করত এ লোকটি তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু”।[১৯৭]

জি হ্যাঁ! সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত সুস্পষ্ট সত্যের বিরুদ্ধে জাহেলি কুরাইশদের অপপ্রচার এমনই ছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নবীজির আনীত বহুমুখী কল্যাণ থেকে মানুষকে দূরে রাখা। লক্ষ্য ছিল, নির্ভেজাল দ্বীনে হকের দাওয়াত থেকে মানুষকে বিমুখ করে রাখা। এমন দাওয়াত থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা যার মূল মর্ম ছিল, তাওহীদ তথা আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য যত কিছুর উপাসনা করা হয়, সেরকম সকল অংশীদার ও মূর্তিকে সর্বাত্মকভাবে অস্বীকার ও বর্জন করা।

আল্লাহ তা’আলা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন; এমন কোনো তাওহীদবাদী ব্যক্তি আজও যদি সমকালীন জাহেলিয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যা গোটা মানব সমাজের ওপর অন্ধকার ছায়া বিস্তার করে আছে, তবে সে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে হুবহু সেসব বিষাক্ত তীর ছুড়ে মারতে দেখবে। দেখবে যে,

[১৯৬] সূরা আল-ফুরকান; ২৫: ০৮
[১৯৭] সূরা সাবা; ৩৪: ৪৩

জাহেলি শক্তি মুজাহিদ ওই বাহিনীটির বক্ষকে লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। সেইসব মুজাহিদদের পেছনে এরা লেগেছে, যারা আল্লাহর অংশীদারদের প্রতি কুফরি করে বিশুদ্ধ তাওহীদের পতাকা উঁচুতে ধরে রেখেছেন। একত্ববাদী ব্যক্তি আরো দেখতে পাবে, অভিশপ্ত জাহেলি শক্তি তাদের অভিধানের এমন কোনো জঘন্য বিশেষণ, ঘৃণ্য উপাধি, মন্দ ও নিকৃষ্ট শব্দ এবং ঘৃণা উদ্রেককারী এমন কোনো বাক্য অবশিষ্ট রাখছে না, যা তারা সত্যবাদী এই দলটির ব্যাপারে ব্যবহার করছে না।

একটু লক্ষ্য করে দেখা যাক তারা কী কী বলছে—এরা ঘাতক... রক্তপাত ঘটানো এদের মূল কাজ...এরা অপরাধী সন্ত্রাসী...নারী শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ত ঝরাতে তাদের বাধে না...এরা উদ্ভ্রান্ত কিছু লোক, যারা অভাবের তাড়নায় বিপথগামী হয়েছে...দারিদ্র ও অসহায়ত্বের শিকার হয়ে তারা বিপথে গেছে...এরা মূর্খ; সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় বাস্তবতা সম্পর্কে এদের কোনো জ্ঞান নেই...এরা বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী এমন একটি দল, যারা বৈধ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মেতে উঠেছে...এরা মাদক ব্যবসায়ী, নেশাদ্রব্যের সওদা এদের পেশা...এরা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ এবং সামাজিক অবহেলার শিকার। তাই বিভ্রান্ত দিশেহারা হয়ে জিহাদী সন্ত্রাসী দলের মধ্যেই নিজেদের আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে...এরা এই...এরা ওই...আরো কত কি!

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ‘মাদারিজুস সালেকীন’ গ্রন্থে লিখেন,

“যাকে নিজ দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা অন্তর্দৃষ্টি, রাসূলের সুন্নতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান এবং নিজ কিতাবের ওপর গভীর ব্যুৎপত্তি দান করেছেন, তাকে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ কত রকম ফিৎনা-ফাসাদ, বিদ‘আত ও বিভ্রান্তির মাঝে ডুবে আছে! রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের দ্বীন থেকে তারা কত দূরে। এমন মু’মিন ব্যক্তি যদি সরল পথে চলতে চায়, তবে সে যেন মূর্খদের টিটকারি, বিদাতপন্থীদের বিদ্রুপ, ঠাট্টা-মশকরা, অপবাদ ও দুর্নাম, তার ব্যাপারে মানুষের মাঝে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা এবং মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া—এই জাতীয় সব প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, এইসব বিভ্রান্ত লোকের পূর্বপুরুষ কাফেররাও হকপন্থীদের ইমাম ও অগ্র-পথিক মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেছে। হকের ঝাণ্ডাবাহী যদি এসমস্ত বাতিল শক্তিকে সরল পথের দিকে ডাকে, তাদের বাতিল মতাদর্শকে যদি সে তুচ্ছ করে, তখনই তাদের প্রলয়ংকারী

ঝড় আরম্ভ হয়ে যায়। তারা হকের বিরুদ্ধে হট্টগোল আরম্ভ করে দেয়। ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। অশ্বারোহী ও পদাতিক সর্বস্তরের বাহিনী নিয়ে হকের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে। তখন হকপন্থী ব্যক্তি নিজের দ্বীন পালন করতে গিয়ে অপরিচিত হয়ে যায়। তারা বিদ'আত আঁকড়ে ধরার কারণে হকপন্থী লোকটি সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে গিয়ে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। তারা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করার কারণে হকপন্থী লোকটি সুন্নাহ সম্মত আকীদাহ বিশ্বাস পোষণ করতে গিয়ে অপরিচিত হয়ে যায়।"

মক্কার সেই প্রথম জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আমাদের কমান্ডার মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী কাফেলা যাত্রা আরম্ভ করেছিল। ঠিক সেই একই জাহেলিয়াত নতুন পোশাকে আজ হাজির হয়েছে। ষড়যন্ত্র, চক্রান্তের জাল বিছিয়ে অপরিচিতির শিকার মুজাহিদ দলের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তারা এমন অশ্লীল নতুন নতুন শব্দ ও বাক্যের আবিষ্কার করছে, যা তাদের পূর্বসূরী প্রথম জাহেলি যুগের নেতৃবৃন্দ চিন্তাও করতে পারেনি।

দ্বিতীয় স্তর: শারীরিক নিপীড়ন

দাওয়াতের গুরুভার বহনের কারণে জাহেলি শক্তির চক্রান্তমূলক অপপ্রচারের মুখে মু'মিন দলের প্রথম সারির লোকেরা ধৈর্য ধারণ করতে থাকেন। একত্ববাদী দলের অনুসারী ও সমর্থকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বল্পসংখ্যক তাওহীদবাদী লোকের উপস্থাপিত দ্বীনে হকের সঙ্গে সত্যান্বেষী ব্যক্তিরা পরিচিত হতে থাকেন। বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের অবিচলতা, আদর্শ কেনাবেচার বাজারে তাঁদের আপোষহীনতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার মানসিকতা হেদায়েত প্রত্যাশীরা প্রত্যক্ষ করেন। সেই সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষ্য করেন বিপ্লবীদের সর্বাত্মক ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিজেদের নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন ও মানব সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা । এ সকল বিষয় চর্ম চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুধাবন করে দ্বীনে হককে সাহায্য করার জন্য আগ্রহী হৃদয়গুলো অধিকহারে দ্বীনি মেহনতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলার এই স্তর পার করার পর আসে দ্বিতীয় অধ্যায়।

দাওয়াত ও দাওয়াতের ধারক-বাহকরা জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনেক কাঠখড় পোড়াতে থাকে। জাহেলি শক্তি প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। মহাকালের এক নির্দিষ্ট সময়ে সত্য ন্যায়ের মুষলধারে বর্ষিত বারিধারা থেকে পান করার আকুতি নিয়ে তাকিয়ে থাকা জনসাধারণ ও হকের দাওয়াতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সবরকম প্রয়াস চালায়। এরপরও যখন জাহেলিয়াতের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন শুরু হয় মু'মিনদের পরীক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায়। তখন দাওয়াতের ধারক-বাহকরা ন্যাক্কারজনক আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক এমন নির্যাতনের শিকার হন, যা শুনে শিউরে উঠতে হয়। রবের প্রতি একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী এবং দাওয়াতী কার্যক্রমে সহায়তা করতে ও মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী খুব কম লোকই সে নির্যাতন থেকে রক্ষা পান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব চরিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি রাসূলদের অনুসারীদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সেসব বিপদাপদের কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন। সমাজ নির্মাতা ও গৌরব অর্জনকারীদের যাত্রাপথের দুর্যোগ ও দুরাবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে আল্লাহর দ্বীনের পথে সংগ্রামকারীরা কন্টকাকীর্ণ বিপদসংকুল এই পথে চলতে গিয়ে অর্জিত তাঁদের পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন। তাঁরা যেন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন, পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার কার্যকারী পথ ও পন্থা শুধুই এটি। উম্মাহর হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের উপায় কেবল এটি। এসব উপলব্ধি করার পরা তাঁরা যেন আর কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করেন। আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ানোর চিন্তা কখনোই যেন না করেন। পালিয়ে যাবার কল্পনাও যেন তাঁদের মাথায় না আসে। তাঁরা যেন এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেন যে, এটাই রাসূলদের পথ, এমনটাই তাঁদের দাওয়াতের প্রক্রিয়া এবং কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের কর্মপন্থা এমনই।

ফেরাউনের অহংকারী সদস্যবৃন্দ ও দুর্বিনীত সুশীল মহলের ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করছেন-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿الأعراف: ١٢٧﴾

'ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বলল, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে? সে বলল, (না, তা কখনো হবে না), আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করে ফেলব এবং মেয়েদের জীবিত রাখব, আমি তাদের ওপর বিপুল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান'।[১৯৮]

জাহেলিয়াতের রক্ষকরা এভাবেই তাদের জাহেলি ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছিল।

এই অভিন্ন চিত্র সময়ে সময়ে দেখা গিয়েছে। এসব চিত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় প্রাক্কালীন একেকটি ধারা ও পর্যায় পরিস্ফুট হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের সময়কার জাহেলিয়াতের অবস্থা তুলে ধরেছেন। এমন এক সময়ের কথা আলোচনা করেছেন, যখন গোটা জাহেলি শক্তি তাওহীদবাদী দুর্বল দলটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার, তাঁদের ঐক্যকে খানখান করে দেয়ার,তাঁদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে। মু'মিন বাহিনীর সদস্যরা তখন নির্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন। বিপদ ও কষ্ট দাওয়াতি গুরুদায়িত্ব বহনকারীদের ওপর পুরোপুরিভাবে আঘাত হেনেছিল। জাহেলিয়াতের দোসররা পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। এমন কোনো পথ ও পন্থা, ষড়যন্ত্রের এমন কোনো উপায় ও মাধ্যম তারা অবশিষ্ট রাখেনি, রবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী জামাতের শক্তি ভেঙে দিতে; যা তারা অবলম্বন করেনি। সত্যপন্থীদের ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে, তাঁদেরকে সর্বাত্মকভাবে দমন করার জন্য কোনো কিছু করতে বাতিল শক্তি পিছপা হয়নি। তাইতো বাতিলের কারাগারের দরজাগুলো খুলে গেছে। মু'মিন বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে অন্ধ কুঠুরিতে কারান্তরীণ রাখা হয়েছে। ইবলিসের পুলিশ বাহিনী আর জাহেলিয়াতের কর্তাব্যক্তিরা প্রথম সারির হকপন্থী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্য নানান শৈল্পিক উপায় উদ্ভাবন করেছে। সাধারণ অনুসারীরা নানা রকম শাস্তি ভোগ করেছেন।

---

[১৯৮] সূরা আল- আরাফ; ০৭: ১২৭

দুর্যোগ-দুর্বিপাক তাঁদেরকে ঘিরে রেখেছে। এমন কোনো একত্ববাদী অবশিষ্ট থাকেননি, যাকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি।

বিপদ মুসিবতের কশাঘাত, নির্যাতিতদের আর্তচিৎকার, দাঈ ও অনুসারীদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্তাক্ত পবিত্র দেহাবশেষ, অন্ধ জাহেলিয়াতের বস্তুবাদী উপায়-উপকরণের অহংকার, হেদায়াতের আলোকবর্তিকা নূরানী কাফেলার ওপর বয়ে যাওয়া দুর্যোগের ঝড়—এতসব অবস্থা পার হওয়ার পর মুষ্টিমেয় মু'মিনরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যেতে আরম্ভ করে। তখনই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়। ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি তখন পরিস্ফুট হয় । জাহেলি শক্তির নির্যাতনে নিষ্পেষিত অবস্থায় আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় সকলের। মৃত্যুভয় ও দুর্বলতার শিকার একটি দল তখন পৃথক হয়ে যায়। বিশ্বাস ও চেতনায় স্থান পাওয়া মতাদর্শের প্রচার-প্রসারে ধৈর্য ধারণের স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। দাওয়াতের গুরুভার বহনে অক্ষম ওই দলটি ইবাদাত ও মুজাহাদার মাধ্যমে আদর্শের প্রাণ সঞ্জীবিত রাখতে পারে না। অটল অবিচল মুষ্টিমেয় ধৈর্যশীল দলের সুখময় পরিণতি পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারে না। দুর্গম রক্ত পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় দফায় কিছু লোক পড়ে যায়। তারা দুর্লঙ্ঘ্য ঘাঁটি অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরপর কান্তার মরু পথে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তৃতীয় দফায় আরও কিছু লোক দুঃসাধ্য এই যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দীর্ঘ সংগ্রাম, মরু রোদ্দুরের তীব্র উত্তাপ, রাতের গভীর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার দুর্ভোগে ক্লিষ্ট, দুর্যোগের লেলিহান শিখায় দগ্ধ কারো কারো মনে বিরক্তি উপস্থিত হতে শুরু করে। বাস্তবতার চাপ সহ্য করতে না পেরে, তারা তখন আপস ও হাল ছেড়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করতে থাকে। সহসাই তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। শেষ পর্যন্ত তারা মূলধারা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শ পিছনে ফেলে আরাম-আয়েশ এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের আশায় তারা বিভোর হয়ে যায়। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগ মোকাবেলার কথা তারা ভুলে যায়। অটল অবিচল মুষ্টিমেয় ধৈর্যশীলদের যে দলটিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি সাপেক্ষে সাহায্য ও বিজয় আসার পরম সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কিছু লোক এই দলটির সঙ্গে সহযোগিতার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

তৃতীয় স্তর: নানাবিধ বৈষয়িক প্রলোভন

জাহেলিয়াতের ঝড়ে যে সময়টাতে দ্বীনে হকের অনুসারী ও নবী রাসূলদের উত্তরসূরীরা গৃহহীন হয়ে যেতে থাকেন, তখন দীর্ঘযাত্রার কোনো কোনো দায়িত্বশীলকে টার্গেট করে প্রলোভনের তীর ছোড়া আরম্ভ হয়। লোভের ফাঁদে আটকে ফেলতে চেষ্টা করা হয় কাউকে কাউকে। দায়িত্ব, ইতিপূর্বের ত্যাগ-তিতিক্ষা, মতবাদ ও আদর্শ সবকিছু কিনে ফেলতে তাদের জন্য টোপ ফেলা হয়। বাতিলের আশা থাকে, ঐশী আহ্বান প্রচারে ত্যাগ স্বীকার করতে না পারা কিছু লোক তাদের টোপ গিলে ফেলবে।

যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও দাওয়াতি কার্যক্রমের উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলদেরকে মোহনীয় কিছু বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও মিথ্যা আশ্বাসের ফাঁপা বেলুন দেখায় জাহেলিয়াতের শয়তানি শক্তি। এই ষড়যন্ত্রের কারণে দুর্বল কিছু লোক পথচ্যুত হয়ে যায়। অস্থায়ী পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লালসা, পদ-পদবির মোহ, উচ্চ আসন ও ক্ষমতা—এসবের পেছনে পড়ে কিছু লোক আদর্শচ্যুত হয়ে যায়। দুনিয়া প্রেমিক ও মৃত্যু ভয়ে ভীত এসব লোকের স্পৃহা স্তিমিত হয়ে যায়। প্রাণ উচ্ছ্বাসে ভরপুর এক সময়কার উচ্চ বৃক্ষটি শুকিয়ে যায়। আদর্শ প্রতিষ্ঠা, নীতি বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসময় যে অন্তরগুলো উৎসাহ-উদ্দীপনায় ছিল জাজ্জ্বল্যমান, সে অন্তরগুলো নিভে যায়।

পরিশেষে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, একসময় ফেরেশতারা পথে-ঘাটে যাদের প্রশংসা করে বেড়াত , সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তিগুলো ঝরে যায়। তারা জাহেলিয়াতের স্তম্ভ ও বড় বড় দায়িত্বশীলে পরিণত হয়। এভাবেই এই জাতীয় লোকদের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী প্রতিফলিত হয়েছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿الأعراف: ١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الأعراف: ١٧٦﴾

‘(হে মুহাম্মাদ) তুমি তাদের কাছে (এমন) একটি মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি (নবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ নাযিল করেছিলাম, সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অতপ’অর শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে তো নিম্নমুখী জমিনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয়তো বা তারা চিন্তা-গবেষণা করবে’।[১৯৯]

[১৯৯] সূরা আল-আরাফ; ০৭: ১৭৫-১৭৬

মুমিন দলের ধৈর্যের সামনে জাহেলি শক্তির অক্ষমতা

জাহেলি শক্তির চক্রান্তের ফাঁদে যারা পা দেয় তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান মিশন থেকে ছিটকে পড়ে। তারা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে নিজেদের অন্যায় অভিলাষ পূরণের ধান্দা করতে থাকে। আর যাদের কপালে সৌভাগ্যের চিহ্ন অঙ্কিত, তাঁরা সৌভাগ্যের সুখগীতি গেয়ে গেয়ে মর্যাদার উচ্চশিখরে আরোহন করেন। দুনিয়ার জীবনে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, অনাগত প্রজন্মের আমানত পৌঁছে দিয়ে, রক্ত দিয়ে বিজয়ের ইতিহাস লিখে স্থায়ী আবাস জান্নাতের পথে সৌভাগ্যের যাত্রা করেন তাঁরা। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের বাণী তাঁদের মাঝে প্রতিফলিত হয়:

"আমাদের কথাগুলো দীপাধারে প্রদীপের শিখা। আজ তার মাঝে কোনো নড়াচড়া নেই। কিন্তু এর জন্য যখন আমাদের জীবন বিলীন হয়ে যাবে, তখন তা জীবন্ত হয়ে উঠবে। জীবিতদের মাঝে তখন তা আলো ছড়াবে।"

জাহেলি শক্তির সব চক্রান্ত জয় করে অটল অবিচল ধৈর্যশীলদের আলোকিত কাফেলাটি রয়ে যাবে। তাঁরা যথার্থভাবে জাহেলিয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রলয়ংকারী ঝড়-ঝাপটার মাঝে তাঁরা দৃঢ় থাকবেন। পথের কষ্ট আর যাত্রার দুর্ভোগ তাঁরা সয়ে যাবেন। খুন রাঙ্গা পথে তাঁরা সতর্কভাবে হেঁটে যাবেন। তাঁদের পথের পাথেয়, তীব্র রোদে শীতল ছায়া ও নির্জনতায় সঙ্গী হবে রবের ওই বাণী, ঐশী আলোর ওই ছটা, যা যুগে যুগে রাসূলদের পাশে জড়ো হওয়া নূরানী কাফেলার পথচলায় ছিল নিত্যসঙ্গী। আল্লাহর ওই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আলোকিত, অটল-অবিচল, ধৈর্যশীল ওই মানুষগুলোর সকল গ্লানি মুছে দিত। ইরশাদ হচ্ছে-

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٨﴾

‘আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখো এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করো। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং দিয়েছেন আখিরাতের যথার্থ সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন’।[২০০]

জি হ্যাঁ, রহমানের সুমিষ্ট আসমানি তারানার তালে তালে জমিনে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক লোকের মোবারক কাফেলা এগিয়ে চলছিল। দুনিয়ার তাবৎ জাহেলিয়াত ও জাহেলি শক্তি যখন তাঁদের প্রতি বিরূপ ছিল, পিচ্ছিল পথে কাফেলার অনেকেই যখন পিছলে পড়ছিল, তখন সত্যের পথে মহিমান্বিত প্রভুর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে কাফেলা পথ চলে ধন্য হয়েছিল।

সর্বযুগে জাহেলিয়াতের প্রাধান্যকালে রাসূলদের অনুসারীরা ওই একই সুরেলা সঙ্গীতের সুর তরঙ্গে নিজেদের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। পথ চলার সময় আল্লাহর প্রতি তাঁদের আস্থা শিথিল হয়নি। কারণ, তাঁদের অন্তরগুলো আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, পথের এই যে কষ্ট, আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য। মহৎ এসব ভাবনার কারণে মৃত্যুর পথে হাঁটতে তারা দ্বিধান্বিত হননি। হাসিমুখে তীর তরবারির বৃষ্টি বুক পেতে নিয়েছেন।

---

[২০০] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১৪৭—১৪৯

নিশ্চয়ই! ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টারত সে সব মু'মিন দল অপরিবর্তিত এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা মনোবল হারাননি। দুর্বলতা তাদেরকে ছুঁতে পারেনি। জাহেলিয়াতের নজরদারি আর পিলে চমকানো নিপীড়ন তাঁদেরকে ভীত করতে পারেনি। বরং তাঁরা একে একে সম্মানের স্তরগুলো জয় করে চলেছিলেন। আল্লাহর ভালোবাসাকে নিজেদের বুকে ধারণ করে গৌরবের সিঁড়িগুলো বেয়ে চলেছিলেন। আল্লাহর দ্বীন, তাঁর শরীয়ত ও শাসন প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বুকে নিয়ে তাঁরা সব রকম প্রতিকূলতার সহ্য করেছিলেন। এভাবেই তাঁদের পবিত্র আত্মাগুলো আরও ধীশক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁদের বোধ ও বুদ্ধি আরও পরিপক্কতা লাভ করেছিল। তাঁদের দূরদৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়েছিল। কারণ, তাঁরা রাসূলদের আসল পথ চিনতে পেরেছেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের সুন্নাহ্'র দীক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন। আসমান জমিনের মালিক মহান আল্লাহর ভালোবাসায় তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য প্রতিকূলতা সহ্য করার বিদ্যা তাঁরা আত্মস্থ করেছেন।

আল্লাহর কসম! নিকষ কালো রাতের অন্ধকারে উজ্জল প্রদীপ তুল্য এই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব এমন ছিলেন, আল্লাহর যিকিরে সর্বদা তরতাজা যাদের যবানে থাকতো ধৈর্য ধারণের দু'আ। তাঁরা আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন, তিনি যেন বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতার মাঝে তাঁদেরকে সবর করার তৌফিক দান করেন। মহান আল্লাহর দরবারে, পরাক্রমশালী প্রভুর সমীপে বিনয়ের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন দেহ মন নিয়ে তাঁরা এই কামনা করতেন, সরল-সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর যেন তিনি তাঁদেরকে অটল অবিচল রাখেন। কারণ, এই পথে চলতে গিয়ে অনেকেরই অন্তর বেঁকে গেছে। অনেকেরই পা পিছলে গেছে। এই পদস্খলন তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে ছেড়েছে। এই পৃষ্ঠপ্রদর্শন তাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছে এবং অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্যতা তাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ﴿الدخان: ٢٩﴾

‘(এ ঘটনার ফলে) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম অশ্রুপাত করল- না জমিন কাঁদল, (আযাব আসার পর) তাদের আর কোনো অবকাশই দেয়া হলো না’।[২০১]

[২০১] সূরা আদ দুখান; ৪৪: ২৯

বিপদাপদ, দাওয়াতের স্বচ্ছতা ও দাঈদের একনিষ্ঠতার পরিচায়ক

এটি অপরিবর্তিত এমন একটি বাস্তবতা, তাওহীদবাদী প্রতিটি ব্যক্তিকেই যা স্বীকার করতে হবে। সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতের ময়দানে বিপদ-আপদ আসবেই। আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুভার বহনকারী প্রতিটি জামাত এই বাস্তবতার মুখোমুখি। যে দাওয়াত প্রচারকারী প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় না, যে দাওয়াতি কাফেলাকে বিপদের অন্ধকার পথ পাড়ি দিতে হয় না, দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কালো ছায়া যে দাওয়াতি জামাতকে আচ্ছন্ন করে না, সে দাওয়াত তো দ্বীনে হকের পূর্ণ দাওয়াত নয়। তা তো হচ্ছে মানবিক লালসা সংমিশ্রিত দাওয়াত। তা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত দাওয়াত। এই অসম্পূর্ণ দাওয়াত সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দাওয়াতের বিপরীত। সরল-সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীম, আর এই দাওয়াতের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনকারীদেরকে বিপদ কেনই-বা ধাওয়া করবে না? জাহেলিয়াতের ঘন আঁধার কেনই-বা মানবতার সূর্যকে আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করবে না? এই দাওয়াতের দায়িত্বশীলগণ কি সকল সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়েও আল্লাহর বেশি প্রিয়? তাঁর বরকতময় সান্নিধ্য লাভে ধন্য মু'মিন দলের চাইতেও তাঁরা কি বেশি মর্যাদাবান? খুঁটিবিহীন আকাশের স্রষ্টার শপথ! কখনই এমনটা নয়। তারা কখনোই অধিক সম্মানিত নয়। তাদের দাওয়াতের পথচলার এই সহজতা সে তো জাহেলিয়াত ও তার ধ্বজাধারীদের সন্তুষ্টি মাত্র। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, জাহেলিয়াত তাদেরকে আঘাত করবে না অথচ সকাল-বিকাল তাওহীদবাদীদের আজানে একমাত্র ইলাহ্'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিধ্বনিত হবে?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾

‘তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্নাতে চলে যাবে, (অথচ) পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের (বিপদের) মত কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি। তাদের ওপর (বহু) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে উঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তা’আলার সাহায্য কবে আসবে। তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী’। [২০২]

ঘোর শত্রু জাহেলিয়াত কীভাবে দাওয়াত ও তার দাঈদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে না অথচ জাহেলি কুরাইশরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অনুসারীদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল? মুহাম্মাদ ﷺ-এর এসব অনুসারীরা তো জমিনে নবী-রাসূলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন! কিন্তু তারপরেও তাঁদের বিরোধিতা করেছিল জাহেলি শক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা দাঈদের বিরুদ্ধে প্রথম যুগের চক্রান্তের কথা এভাবে তুলে ধরেন—

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ابراهيم: ١٣﴾

‘কাফিররা তাদের রাসূলদের বলল, ‘ আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো; অতঃপর (ঘটনা চরমে পৌছুলে) তাদের মালিক তাদের কাছে ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের ধ্বংস করে দেবো’। [২০৩]

---

[২০২] সূরা আল-বাকারা; ০২: ২১৪
[২০৩] সূরা ইবরাহীম;১৪: ১৩

রাসূল ﷺ মুসান্না ইবনে হারেসার প্রতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ঈমান আনা এবং এই কালিমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার আহ্বান জানালেন। তখন নিজের সহজাত সরল গ্রামীণ চিন্তাভঙ্গি দ্বারা এই কালিমার মর্মবাণী অনুধাবন করে মুসান্না ইবনে হারেসা জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এটি এমন একটি বিষয় যা রাজা-বাদশাদের অপছন্দের। আরব আজম সকলেই আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"

কীভাবে রাজা বাদশা, কিসরা কায়সার, শাসক মহল ও প্রবৃত্তি পূজারীরা দাওয়াত ও দাঈদের বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে থাকতে পারে?

এটা কীভাবে হতে পারে যে দ্বীনে হকের চিরশত্রু জাহেলিয়াত এর বিরোধিতা করবে না? দ্বীনে হকের দাওয়াতকে সমূলে মিটিয়ে দিতে চাইবে না? অথচ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বারবার নবীজি ﷺ-কে এ কথা বলছিলেন, "হায়! আমি যদি সে সময় থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দেবে!" নবীজি ﷺ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে অনেকটা অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমাকে বের করে দেবে আমার সম্প্রদায়?" তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পথে দাওয়াতের বাস্তবতা অনুধাবনকারী নওফেল জবাবে বলেছিলেন, "ইতিপূর্বে যারাই আপনার মত পয়গাম নিয়ে এসেছে তারাই শত্রুতার শিকার হয়েছে।"

হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীরা! তোমাদের নবীর মত পয়গাম নিয়ে ইতিপূর্বে যারাই এসেছেন, সকলেই বৈরিতার শিকার হয়েছেন। যারাই দ্বীনে হক্বের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, জাহেলিয়াত তাদের বিরুদ্ধেই উঠে পড়ে লেগেছে। যারাই বিশুদ্ধ তাওহীদের বাণী ঘোষণা করেছেন, জাহেলিয়াত একযোগে তাঁদের ওপর হামলে পড়েছে। ইব্রাহীম খলীলের দাওয়াত নিয়ে যারাই দাঁড়িয়েছে, তাঁদের সকলকে নিজ নিজ সম্প্রদায় বহিষ্কার করেছে।

হে সত্যের অনুসারীরা! এটাই বাস্তবতা। তোমাদের নবীদের সীরাত এমনই। তোমাদের কাছে থাকা তোমাদের রবের কিতাবের নির্দেশনা এটাই। আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা বুঝতে তোমরা মহাগ্রন্থ খুলে পাঠ করে দেখো।

আল্লাহর তৌফিকে উপরোক্ত আলোচনার পর প্রত্যেক তাওহীদবাদী ব্যক্তির কাছে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, বিপদ মুসিবত হলো আল্লাহর পথে দাওয়াতের বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। এ হচ্ছে সত্যের পথে থাকার নিদর্শন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাসূলগণ, বিচার দিবস পর্যন্ত আসতে থাকা তাঁদের সৌভাগ্যবান অনুসারী ও উত্তরসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই দাওয়াতের দায়িত্বশীলগণ যখন পথ চলতে চান, তখন এই সমস্ত নিদর্শন তাঁদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সত্যান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট যে, জাহেলিয়াত যে দাওয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা করে না, চক্রান্ত করে যে দাওয়াতকে নিস্তব্ধ করে দিতে চায় না, তা সরল সঠিক পথ তথা সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত দাওয়াত। দ্বীনে হক্কের মূলধারা থেকে তা বিচ্ছিন্ন।

আমাদের প্রিয় শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আমাদের মন-মস্তিষ্কে এ ধারণা যেন বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, দ্বীনে হক আঁকড়ে ধরার কারণে অনিবার্যভাবেই আহলে বাতিলের তরফ থেকে শত্রুতার শিকার হতে হবে। আমাদের আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, বুখারী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সঙ্গে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। অতঃপর ওহী নাযিল হতে আরম্ভ করার ঘটনা তাকে শোনালেন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেন, ‘হায় আফসোস! আমি যদি ওই সময় থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দেবে!’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমাকে বের করে দেবে তারা!” তখন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেন, ‘ইতিপূর্বে যারাই আপনার মতো পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তারাই শত্রুতার শিকার হয়েছেন।’ এই হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ফিকহ্। অতএব, যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে, তাঁকে অবশ্যই শত্রুতার শিকার হতে হবে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এই কালিমা ও তার দাবি পূর্ববর্তীরা এভাবেই বুঝেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এর জন্য শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে।

মুসান্না ইবনে হারেসা আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে এমনটাই তো বলেছেন, যখন নবীজী তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার প্রতি ঈমান আনার, রক্ষা করার ও আশ্রয় দেয়ার জন্য আহ্বান জানালেন, “এটি এমন একটি বিষয় যা রাজা-বাদশাদের অপছন্দের।”

কারাবরণকারী শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি রাসূলদের অনুসারীদের পথ ও তার নিদর্শনাবলী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, “আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখুন। মিল্লাতে ইবরাহীমের এই দাবি তথা কাফের ও তাদের উপাস্যদের সাথে সর্বাত্মকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ, প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ, তা বিরাট বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই কেউ যেন ধারণা না করে, এই পথ পুষ্পশোভিত অথবা আরাম-আয়েশের অবকাশ পূর্ণ। বরং তা —আল্লাহর কসম—অপছন্দনীয় বিষয়াবলী ও বিপদাপদে ভরা। তবে, এর শেষ হচ্ছে সুবাসিত, প্রশান্তি ঘেরা এবং ক্রোধমুক্ত অবস্থায় রব্বী কারীমের সন্তুষ্টি বেষ্টিত। আমরা নিজেদের ও মুসলিমদের জন্য বিপদ কামনা করি না। কিন্তু এ পথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সুন্নাহই হচ্ছে এটা, যাতে অপবিত্র পবিত্র থেকে আলাদা হয়ে যায়। এপথ কখনোই শাসক মহল ও প্রবৃত্তি পূজারীদের তুষ্ট করতে পারে না। কারণ, তা তাদের বাস্তব অবস্থার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। এপথে তাদের উপাস্য ও শিরকী কর্মকাণ্ডের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। এর বাইরে অন্যান্য পথের অনুসারীদের দেখা যাবে, তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে। দুনিয়ার মোহে তারা আবিষ্ট। বিপদ-আপদের কোনো চিহ্নই তাদের মাঝে দেখা যায় না। আর তা কেনই বা দেখা যাবে, মানুষ তো তার দ্বীন অনুপাতে বিপদের সম্মুখীন হয়। সে হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত নবীগণ। অতঃপর যারা সবচেয়ে বেশি তাঁদের কাছাকাছি এবং এঁদের পরে যারা সবচেয়ে বেশি নবীদের কাছাকাছি...। মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারীরা মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন। কারণ, আল্লাহর পথে দাওয়াতের

ক্ষেত্রে তারা নবীদের মানহাজের অনুসারী...যেমনিভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল নবীজি ﷺ-কে বলেছেন,

“ইতিপূর্বে যারাই আপনার ন্যায় পয়গাম নিয়ে এসেছেন তারাই শত্রুতার শিকার হয়েছেন।”

অতএব, যদি তুমি দেখতে পাও, এ যুগে কেউ দাবি করছে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শের দিকে নবীজিরই পন্থায় দাওয়াত দিচ্ছে কিন্তু বাতিলপন্থী শাসক মহলের সাথে যদি তার শত্রুতা না থাকে, বরং তাদের মাঝেই সে যদি নিরাপদে নিশ্চিন্তে বসবাসের সুযোগ লাভ করে, তবে এমন ব্যক্তির অবস্থা ভালোভাবে লক্ষ্য করো। হয়ত সে পথচ্যুত; নবীজি ﷺ-এর আদর্শের ওপর সে নেই, বরং অন্যান্য বক্রপথের সে অনুসারী। নয়ত সে নিজের দাবির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। অথবা সে বিশেষ কিছু কারণে এমন বিষয়ের দাবি করছে, যার যোগ্য সে নয়। সে কারণ হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মগরিমা ও নিজের ব্যাপারে ভালো ধারণা, অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ, যা হাসিলের জন্য সে দ্বীনদার মহলের বিরুদ্ধে শাসকবর্গের গোয়েন্দা ও গুপ্তচর হয়ে কাজ করছে'।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইয়াতকালে সাহাবাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আসআদ ইবনে যুরারা তাঁদেরকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “হে ইয়াসরিববাসী! ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নাও। আজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নেয়াটা গোটা আরবের সাথে তোমাদের বিচ্ছেদ বলে গণ্য হবে। এ কাজ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবননাশ আর তোমাদের তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সমতুল্য হবে। তাই যদি তোমরা এসবের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারো, তবে তাঁকে গ্রহণ করো এবং এক্ষেত্রে তোমাদের প্রতিদান থাকবে আল্লাহর কাছে। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণের ভয় করো, তবে তাঁকে এড়িয়ে যাও এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট করো। সেক্ষেত্রে তোমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অপারগতা বলে সাব্যস্ত হবে।”[২০৪]

[২০৪] এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মদীনায় হিজরতের পূর্বের ঘটনা। মদীনা থেকে আগত একদল মুসলিমদের সাথে মদীনায় হিজরতের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ । মদীনার আনসারদের কাছে

মুমিন দলের কিছু বৈশিষ্ট্য

যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের গুরুভার নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন, সেসব মহামানবের ও রব্বানী সেই কাফেলার নিদর্শন, বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় গুণাবলী শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। যাতে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও কন্টকাকীর্ণ পথ চিনতে কারো অসুবিধা না হয়।

শাইখ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল ইসলাম ওয়া মুস্তাকবাল আল বাশারিয়্যাহ্' নামক গ্রন্থে বলেছেন, “ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কিছু দল থাকা অপরিহার্য, যেগুলো দাওয়াতের ও আকীদাহ্ বাস্তবায়নের পথে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এসব দলের জানা থাকতে হবে, যাদের নেতৃত্বে মানবতার মুক্তির সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তাঁরা সাধারণ মানুষ হন না। দাওয়াত ও আকীদার পথে সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করতে শিখতে হয় তাঁদের। যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাঁদের মাঝে থাকা অপরিহার্য তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হচ্ছে-

প্রথমত:

আল্লাহওয়ালা হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿آل‌عمران: ٧٩﴾

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কি প্রত্যাশা করেন তা বিস্তারিত বলার পর আসআদ ইবনে যুরারা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উক্তিটি করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা বাইয়াতে আকাবা নামে পরিচিত - সম্পাদক

তোমরা রব্বানী তথা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এটা এই কারণে যে, তোমরাই মানুষদের (এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তাই) অধ্যয়ন করছিলে'।[২০৫]

রব্বানী বলা হয় এমন আলেমকে, যিনি তদনুযায়ী আমল করেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের রব্বানী শব্দের তাফসীরে বলেন, 'তাঁরা হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ'। যেদিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন, সেদিন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, 'এই উম্মাহর রব্বানী আজ ইন্তেকাল করেছেন।'

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٦﴾

'আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে বহু 'রিব্বি' জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে- তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন'।[২০৬]

এ আয়াতেও রিব্বি হচ্ছেন, যারা রব্বানী। কারণ, তাঁরা আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব পুরোপুরি চিনতে পেরেছেন, তাঁর ইবাদাত করেছেন এবং এ পথে ধৈর্য ধারণ করেছেন।

তাই আন্দোলন ও বিপ্লব, দাওয়াত, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, ধৈর্যধারণ, ইলম ও আমল সবকিছুতেই একজন রব্বানী হতে হবে। অর্থাৎ এমন হতে হবে, একটা মুহূর্ত যেন এই বোধ জাগরুক না থাকা অবস্থায় পার না হয় যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি সম্মানের উৎস, একমাত্র তিনিই যথেষ্ট, তিনি রক্ষাকর্তা, একমাত্র তিনিই হেফাজতকারী ও নিরাপত্তাদানকারী।

---

[২০৫] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ৭৯
[২০৬] সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১৪৬

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿الزمر: ٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿الزمر: ٣٧﴾

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? [২০৭]

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الأنعام: ١٧﴾

‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন (তাহলে তাতেও কেউ বাধা দিতে পারে না,) তিনি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান’। [২০৮]

এটি অপরিহার্য বিষয় যে, দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি এই আয়াতের প্রতি নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ‘আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান’ এরপর জাহেলি সুশীল সমাজকে এই ঘোষণা শোনাবে-

قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿الأعراف: ١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿الأعراف: ١٩٦﴾

‘বলে দাও, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, অতঃপর আমার অমঙ্গল করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না’।[২০৯]

---

[২০৭] সূরা যুমার; ৩৯: ৩৬-৩৭
[২০৮] সূরা আল-আন‘আম; ০৬: ১৭
[২০৯] সূরা আল আ‘রাফ; ০৭: ১৯৫-১৯৬

আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা, মান-সম্মান ও আত্মিক দিক-নির্দেশনা নেয়া ছাড়া মানুষের কোনো বিকল্প নেই। মানবতার মুক্তির সংগ্রামে যে ব্যক্তি নিয়োজিত হতে চায়, তার জন্য এটা অপরিহার্য যে, অন্য সকল মানুষের তুলনায় আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক অধিক দৃঢ় হবে। মানব সমাজকে পবিত্র করার চ্যালেঞ্জ যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে চায়, তাকে সব মানুষের তুলনায় অধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে। যে ব্যক্তি মানব সমাজকে উঁচু করতে চায়, তাকে অন্য সবার চেয়ে বেশী উঁচু ও মহৎ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত:

দাওয়াতের ক্ষেত্রে পার্থিব স্বার্থ, বৈষয়িক উপকারিতা এবং দ্রুত ফলাফলের আশা পরিত্যাগ করতে হবে।

কারণ, নবীগণ এ কথা বলতেন-

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿الشعراء: ١٤٥﴾

‘আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন’। [২১০]

সূরা আশ-শুআরাতে রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) জবানিতে এই আয়াতের কথা বারবার এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আমের ইবনে সা'সা' গোত্রের কাছে ইসলাম পেশ করলেন। তখন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য বুহাইরা ইবনে ফারাস জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা বলুন তো! আপনার এই বিষয় মেনে নিয়ে আমরা যদি আপনার কাছে বাইয়াত দেই, অতঃপর আপনার বিরোধীদের ওপর আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয়ী করেন, তবে আপনার পর কি আমরা সেই কর্তৃত্ব লাভ করতে পারব”? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, “এই কুরসি তো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করবেন।” এটা শুনে তখন তারা নবীজীকে প্রত্যাখ্যান করে।

---

[২১০] সূরা শু‘আরা; ২৬: ১৪৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর রব এ কথা জানিয়েছেন-

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿الزخرف: ٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَٰهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿الزخرف: ٤٢﴾

‘অতঃপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছে থেকে অবশ্যই (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেব। অথবা তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দিব যার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান’। [২১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালভাবেই জানতেন, এই দ্বীন একদিন না একদিন অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। তিনি মুসলিমদের মধ্যে কাউকে জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন না। অন্য কোনো বিষয়ের জন্য বাইয়াত নিতেন না। তাইতো আমরা দেখতে পাই, নির্যাতিত নিপীড়িত একটি পরিবারকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, “হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।”

বাইয়াতে আকাবার দিন নবীজি ﷺ আনসারদের লক্ষ্য করে বলেন, “আমি এই মর্মে তোমাদের থেকে বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা দাও, আমাকে ঠিক সেভাবে নিরাপত্তা দেবে।” তখন তাঁরা বললেন, ‘আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করলে আমাদের জন্য কী রয়েছে হে আল্লাহর রাসূল’? তখন তিনি ইরশাদ করেন, “জান্নাত”।

অতএব, আল্লাহর সঙ্গে বাইয়াত ও চুক্তিবদ্ধ হতে হবে জান্নাতের ব্যাপারে। আর দুনিয়াতে বাইয়াত হবে জান্নাতের জন্য কাজ করার ব্যাপারে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿التوبة: ١١١﴾

---

[২১১] সূরা আয যুখরুফ; ৪৩: ৪১-৪২

'নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত'।[২১২]

তৃতীয়ত:

অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি নির্ধারণ করতে হবে।

নমুনা ও আদর্শ হিসেবে অল্প কিছু লোককে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে নয়। কারণ, মানুষ নমুনা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শিক ব্যক্তিবর্গকে দেখে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনে। তাই সংখ্যার চাইতে মানের ব্যাপারে আমাদের বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। সত্যবাদী ধৈর্যশীল লোকেরা যদি সংখ্যায় অল্প হন, তবুও আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জয় লাভ করেন।

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। [২১৩]

অলঙ্ঘনীয় এই মূলনীতি রিদ্দার[২১৪] ফিতনা চলাকালে গোটা আরব উপত্যকায় ইসলাম ফিরিয়ে এনেছিল। কারণ, সে সময়কার অনুসৃত ব্যক্তিদের মাঝে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রিদ্দার সংবাদ জানতে পেয়ে বলেছিলেন, "তারা যদি একটি উট পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিত, তবে এর জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। অথবা এই কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবো। আমি জীবিত থাকতে দ্বীনের মাঝে শিথিলতা করা হবে!!"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "তারা যদি একটি দড়ি পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনী দ্রুত পাঠানোর ব্যাপারে জোর দেন। তখন যারা তাঁর কাছে বিলম্বের আবেদন করেন, তাঁদেরকে তিনি এই বলে জবাব

---

[২১২] সূরা আত-তাওবা; ০৯: ১১১

[২১৩] সূরা আল-বাকারা; ০২: ২৪৯

[২১৪] ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া। -সম্পাদক

দেন, "ঐ সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই! যদি কুকুরের দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের পা কামড়ে ধরে, তবুও আমি ওই বাহিনীকে ফেরত আনব না, যা রাসূলুল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "যদি আমার মনে হয়, হিংস্র পশু আমাকে ছো মেরে নিয়ে যাবে, তবুও আমি উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করব।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর উদ্ভূত সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের মতো একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বকে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন অবস্থানের দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছায় পুরো উম্মাহকে ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেসব আদর্শবান ব্যক্তির উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত, যারা অজ্ঞাত অবস্থা ও অপরিচিতির মাঝে প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেন। যারা বন্ধু-শত্রু কারো কথায় আদর্শ বিকিয়ে দেবার কথা চিন্তাও করেন না।

সেসব অনন্যসাধারণ ব্যক্তির যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান অপরিহার্য, যারা জাহেলী সমাজের তাপে গলে যান না। সমাজের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে গেলে যে বৈরী পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোর সামনে যারা নত হয়ে যান না। আমরা সে সমস্ত প্রত্যয়দীপ্ত ব্যক্তিকে চাই, যারা জাহেলিয়াতের বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যান না।

ইরাক ও পারস্য বিজয়ের দিন মুসলিম বাহিনীর ভরা নদী পার হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিকদেরকে হতবাক করে দিয়েছে।[২১৫] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিমরা দজলা নদী পার হয়েছেন অথচ তাঁদের একজন সেনাসদস্য হাতছাড়া হয়নি। তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো: এই বাহিনী ততকালের সবচেয়ে বড় দুটি সভ্যতা রোম ও পারস্য বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ও

---

[২১৫] শত্রুরা,মুসলিমদের ধাওয়া খেয়ে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনীর কাছে নদী পাড়ি দেবার কোনো বাহন ছিলো না। তারওপর, তাঁদের অনেকেই এই প্রথমবারের মতো নদী দেখছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁরা ঘোড়া,উট ইত্যাদির পিঠে আরোহন করেই নদীতে নেমে যান। আল্লাহ মুসলিমদের একটি কারামত দেখান। আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা সকলেই নিরাপদে নদী পার হয়ে যান। শত্রুরা এ অবস্থা দেখে প্রচন্ড ভীত হয়ে পড়ে। তারা লড়াই করার মনোবল হারিয়ে ফেলে। মুসলিমরা সহজেই বিজয় লাভ করেন। –সম্পাদক

বিজয়ী হয়েছে, অথচ তাদেরকে নীতি-চরিত্র হারাতে হয়নি কিংবা নিজেদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয় নি

আল্লাহ তা'আলা কিসরাকে অপদস্থ করেছেন এবং তার সিংহাসন ধ্বংস করেছেন। কিসরা কেঁদে কেঁদে একথা বলত, 'হায়! আমার একহাজার পাচক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এত অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব?' অপরদিকে পারস্যের মুসলিম আমীর সালমান আল ফার্সি রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন মাত্র এক দিরহাম খরচ করতেন!

চতুর্থত:

সত্যিকার ইলম ও খাঁটি আমলের মাধ্যমে দাঈদের আত্মগঠন।

এটি একটি অপরিহার্য বিষয় যে, দাঈ ব্যক্তি নিজে অথবা তার শাইখের তত্ত্বাবধানে আত্মগঠনে মনোযোগী হবেন। এ লক্ষ্যে তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াত এবং তাফসীর ও বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন সহকারে কুরআনে কারীমের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। এমনিভাবে ই'তিকাফের মাধ্যমে মসজিদে সময় দিয়ে আত্মগঠনের কাজ করবেন। কারণ মসজিদে সকীনা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতাদের সম্মেলন ঘটে।

এমনিভাবে আল্লাহর পথের দিশা লাভ হয়, এমন উত্তম সান্নিধ্য গ্রহণ করা জরুরি। জি হ্যাঁ ভাই! যাদের সংস্রবে আল্লাহর পথের দিশা লাভ হয়, যাদের কথায় আখিরাত স্মরণ হয়, খুব গুরুত্বের সঙ্গে তাঁদের সান্নিধ্য অর্জন করতে হবে।

আর রাতের নামাযের কথা ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না। কারণ আত্মিক পরিশুদ্ধি ও স্বচ্ছতা অর্জনে এই আমলের গভীর অবদান রয়েছে।

রাতের নামাযের এই আমল সৎ লোকদের অভ্যাস ছিল। এমনিভাবে নফল সিয়াম পালন করা, বিশেষভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে উক্ত আমল করা খুবই ফজিলতপূর্ণ।অন্তরকে জীবন্ত রাখার জন্য, শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখার জন্য, বাজে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য সার্বক্ষণিক যিকিরের কোনো বিকল্প নেই।

এমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি আমল হচ্ছে, স্বচ্ছলতার সময় শুকরিয়া আদায় এবং বিপদের সময় ধৈর্যধারণে অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলা। গুনাহ থেকে ইস্তেগফার, আকীদাহ ও আদর্শের পথে ত্যাগ স্বীকার, দুর্যোগ মোকাবেলা ও কষ্ট সহ্য করতে শেখা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল।

প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনার মধ্যে কিংবা ইবাদাত ও আমলের মধ্যে সময় কাটিয়ে সময়কে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মজলিস কিংবা বৃথাই রাত জেগে নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য জায়েজ নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত এবং পূণ্যবান পূর্বসূরীদের জীবনী পাঠ করে নিজেদের জন্য বিশুদ্ধ চিন্তা ধারা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করা।এসব কিছুর সঙ্গে দাওয়াত, মসজিদসমূহে মানুষকে দ্বীনী বিষয় শিক্ষাদান, সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মাঝে দ্বীন প্রচার, সেই সঙ্গে আদব ও বুঝ সহকারে ইলমি বৈঠকগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি কাজগুলোতে নিজ অন্তরকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ইলমি বিষয়ের পাশাপাশি সাইয়্যেদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব প্রমুখদের রচনাবলী পাঠ করতে হবে। আর এই সবকিছুই সহীহ নিয়্যত ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে করা অপরিহার্য।

এ সমস্ত গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, এগুলোকে ব্যক্তির মান-সম্মান বৃদ্ধির কারণ বানান এবং এগুলোর মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحج: ٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿الحج: ٤١﴾

“আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলারই এখতিয়ারভূক্ত"। [২১৬]

সাহায্য ও বিজয়

এটি এমন একটি বাস্তবতা যা সন্দেহাতীত। কোনো প্রকার সংশয় একে ঘিরে তৈরি হতে পারে না। কোনো প্রকার অস্পষ্টতা এ বিষয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছে; এমন কোনো তাওহীদবাদী ব্যক্তির মনে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই সাহায্য ও বিজয় অবশ্যই রূপ লাভ করবে। সাহায্য ও বিজয়ের এই বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যিনি দাওয়াতের পথে রয়েছেন, যিনি রবের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও আমানত পূরণের সংগ্রামে রয়েছেন।

সময় যতই পার হোক বিজয় অবশ্যই আসবে। জাহেলিয়াত যতই শক্তিশালী হোক, জাহেলি শক্তি যতই ষড়যন্ত্র করুক, দম্ভভরে চক্রান্তের যতই জাল বিস্তার করুক, যতভাবেই তারা চেষ্টা করুক, জঘন্য ও নিকৃষ্ট যত উপায়ই তারা অবলম্বন করুক, প্রচার প্রোপাগান্ডা ও বৈষয়িক শক্তি নিয়ে যতভাবেই তারা উপস্থিত হোক না কেন, মু'মিনদের পক্ষে বিজয় আসবেই। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় এমনটাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পুরো ব্যবস্থাকে তিনি এভাবেই সাজিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্তনা ও সুসংবাদ দান করেছেন। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে যখন মক্কার পাহাড়-পর্বত ছেয়ে গেছে, মক্কায় রাসূলুল্লাহর দাওয়াত যখন বাহ্যিক বিচারে কাঙ্খিত ফলাফলশূন্য হলো,কুরাইশের বড় বড় অপরাধীরা যখন সীমালংঘন করল, জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবে মোস্তফা ﷺ-কে সান্তনা ও সুসংবাদ জানিয়ে ইরশাদ করেন-

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿يوسف: ١١٠﴾

---

[২১৬] সূরা আল-হাজ্জ; ২২: ৪০-৪১

‘এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেত, তারা মনে করত, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাঁকেই শুধু (আযাব থেকে) নাযাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না’।[২১৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “(এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে) তাঁরা হলেন নবীদের অনুসারীগণ। নবীদের প্রতি তাঁরা ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁদেরকে সত্যায়ন করেছিলেন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন থাকেন, সাহায্য বিলম্বিত থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ যখন তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের এই ধারণা জন্মে গেল যে, তাঁদের সম্প্রদায় তাঁদেরকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, তখন রাসূলদের কাছে আল্লাহর সাহায্য আসে”।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার পর খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি; এর ভেতরেই আনসারদের কাফেলা মক্কায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মূলত: সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা’আলা তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার বাইয়াতে আবদ্ধ হন। আর এটাই ছিল প্রথম বাইয়াতে আকাবা । আর এরপর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা। এরপর মক্কা মুকাররমা থেকে পবিত্র শহর মদীনা-মুনাওয়ারায় প্রথম মুহাজির কাফেলা হিজরত করে। হিজরতের সোনালী এই সূত্রে সর্বশেষ যুক্ত হয়ে একে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন মুহাম্মাদ ﷺ। আরহামুর রাহিমীন মহান প্রভুর অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড ছেড়ে ইসলামী জগতের প্রাণকেন্দ্র, পূণ্যময় পবিত্র ভূমি মদীনায় হিজরত করেন। এতে করে বরকত ঘেরা এই ভূমিতে মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে প্রথম ইসলামী সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। কুরআনের অনুশাসনে পরিচালিত এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পর কুরাইশের জাহেলী সামরিক শিবিরের সাথে তাওহীদবাদী শিবিরের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

---

[২১৭] সূরা ইউসুফ; ১২: ১১০

নিশ্চয়ই! মদীনার পবিত্র ভূমিতে কুরআনের অনুশাসনে পরিচালিত যে সমাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাত ধরে গঠিত হয়েছিল তা এমনি এমনি অস্তিত্বে আসেনি। বরং তা ছিল এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। তা ছিল বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল।

প্রথম যুগের ধৈর্যশীল সাহাবীদের অবস্থা, তাঁদের বেদনাদায়ক উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের ধারা এবং জাহেলিয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি মু'মিন দলের অগ্রযাত্রার সঠিক কর্মপন্থা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। মানবসমাজের ভ্রান্ত চিন্তাধারা জাহেলিয়াতের যে সমস্ত মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত, সেগুলোর বিলোপ সাধনকারী দলের পথচলার রূপরেখা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। মু'মিনরা একথা বুঝতে পারেন, সাহায্য ও বিজয়ের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করা, সাথীদের রক্তমাখা লাশের স্তূপের ওপর দিয়ে জিহাদের খুন রাঙ্গা পথ পাড়ি দেয়া একান্ত অপরিহার্য।

সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, "দাওয়াতের পথে এটি আল্লাহর সুন্নাহ যে, এখানে বিপদ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। এ পথে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে। চরম বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সাহায্যের যত বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে ঘিরে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলা খেতে থাকে, যাবতীয় উপায় ও মাধ্যম থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। তখন যাদের মুক্তি লাভের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। তাঁরা অবিশ্বাসীদের ওপর আপতিত হতে চলা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। পরাক্রমের অধিকারী গোষ্ঠী যেই ধ্বংসযজ্ঞ ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চালায় তা থেকে যোগ্য ব্যক্তিরা বেঁচে যান। আর অপরাধীদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে। আল্লাহর ভয়ঙ্কর শাস্তি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। তারা দাঁড়াবার সুযোগটাও পায় না। অপর কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তাদেরকে এই আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না।

এসবের তাৎপর্য হলো, বিজয় যেন মূল্যহীন এমন কোনো বিষয়ে পরিণত না হয়, যার দরুন বিপ্লবী দাওয়াত একটি তামাশা হয়ে দাঁড়াবে। সাহায্য যদি এতটাই সস্তা হতো, তাহলে প্রতিদিন নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন মতবাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত।

এর জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হতো না। অথবা হলেও খুবই কম ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। আর দ্বীনে হকের দাওয়াত ঠাট্টা মশকরা ও তামাশার বিষয় হওয়াটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ, এই দাওয়াত তো মানব গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালী ও মানহাজ। তাই অনধিকার চর্চাকারীদের কুকর্ম থেকে একে রক্ষা করা অপরিহার্য”।

সাহায্য ও বিজয়: আল্লাহর সুন্নাহ্

আল্লাহর সুন্নাহ হলো- সর্বদাই আল্লাহর সাহায্য, সহায় সম্বলহীন অল্পসংখ্যক মু’মিন বান্দার ওপর অবতীর্ণ হয়। এই মানুষগুলো সর্বময় শক্তির অধিকারী, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহর সঙ্গে এমন মজবুত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, যা কখনোই ভেঙে যাবার নয়। এই মানুষগুলো শান-শওকত ও প্রাচুর্যের অধিকারী জাহেলি শক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। তাঁরা নিজেদের আদর্শের ওপর অটল, শত প্রতিকূলতা ও বৈরী পরিবেশের মাঝেও অবিচলতার মূর্তপ্রতীক। তাই জাহেলিয়াত যখন তার সর্বশক্তি নিয়ে সীমিত সম্বলের, বিপ্লবী, দ্বীনের ব্যাপারে আপোষহীন, মুষ্টিমেয় মু’মিন বান্দাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঐশী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এই জামাত যখন জাহেলিয়াত ও তার ধ্বজাধারীদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত হয়, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যখন তাঁরা নিরাশ হওয়ার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যায়, ঠিক সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের অব্যাহত ধারা প্রবাহ আরম্ভ হয়ে যায়। বিজয়ের সূর্য সেসময় উম্মাহর আকাশে হেসে ওঠে। অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রভাতের আলোয় ধীরেধীরে চারিদিক উদ্ভাসিত হতে শুরু করে। বিজয়ের সুরেলা আজানে ঘোর অমানিশা কেটে যাওয়ার ঘোষণা শোনা যায়। অথচ একসময় এই ঘোর অমানিশায় চারিদিক ছেয়ে ছিল। রাসূলদের অনুসারীরা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত ও দায়িত্ব পালনকারীরা একসময় নানান শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿يوسف: ١١٠﴾

'এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেত, তারা মনে করত, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাসী সাব্যস্ত করা হবে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাঁকেই শুধু (আযাব থেকে) নাযাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না'।[২১৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিতাবুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের গুরুভার বহনকারীদের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সাধারণ রীতি ও সুন্নাহর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহায্য লাভ করাটা সীমিত সহায় সম্বলের অধিকারী মুষ্টিমেয় ধৈর্যশীলদের পথের সঙ্গী। তাইতো পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿البقرة: ٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿البقرة: ٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ

---

[২১৮] সূরা ইউসুফ; ১২: ১১০

بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿البقرة: ٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿البقرة: ٢٥١﴾

‘মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াই-এর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল (লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল) । আর আল্লাহ তা’আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের ওপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরও বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ

করল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হলো, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো-আর আমাদের সাহায্য করো সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিলো এবং দাউদ, জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়”। [২১৯]

তাদের হাজার হাজার লোক বের হয়েছিল। কিন্তু সাহায্য কাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে? নিশ্চয়ই তা অবতীর্ণ হয়েছিল সীমিত প্রস্তুতি ও সম্বলের অধিকারী অল্পসংখ্যক মু'মিন বান্দাদের ওপর। তাঁরা ছিলেন অটল-অবিচল, ধৈর্যশীল। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বদরের মুজাহিদদের চেয়ে তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিল না। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেয়া, ভালো থেকে মন্দ পার্থক্য হওয়া, উপযুক্ত অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হওয়া, কপটতা ও মনের গোপন বিষয় প্রকাশিত হওয়া, অবস্থার প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে অনেকেরই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, ভূমি সংকীর্ণ হয়ে আসা, যাত্রা দীর্ঘায়িত হওয়া, যাত্রাপথে সংখ্যা স্বল্পতার দুর্ভোগ পোহানো এবং জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের জন্য রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে অনিবার্য পরীক্ষায় অনেকেই অকৃতকার্য হওয়া... এতকিছুর পর তাঁরা বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

---

[২১৯] সূরা আল-বাকারা; ০২: ২৪৬—২৫১

‘আল বাহরুল মুহিত’ নামক তাফসীর গ্রন্থের লেখক বলেন, “আধিক্য বিজয়ের কারণ নয়। কারণ, অনেক সময় এমন দেখা গেছে যে, অল্প সংখ্যক লোক সংখ্যায় অধিক যারা তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছে।”

মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পূণ্যবান সাহাবাদের ওপর সাহায্য তখনই অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য এবং তাঁদের সহায় সম্বল ছিল সীমিত। আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে বদরের ঘটনা। বিশেষ তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ অমান্য করার আগ পর্যন্ত উহুদের ঘটনাও বদরের অনুরূপ। খন্দকের যুদ্ধের সময় গোটা জাহেলি শক্তিকে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা’আলা নিজ কুদরতের মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত করে দেন। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। এমনকি অনেকেই এমনটা বলে ফেলেছিলেন, 'আজ অন্তত সংখ্যা স্বল্পতার দরুন আমরা পরাজিত হব না।' অতঃপর নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পর অন্তরের বস্তুবাদী নির্ভরতা ও আল্লাহর শক্তি-সাহায্যের কথা ভুলে যাওয়ার ওই মুহূর্তে তারা সাময়িক পরাজয় বরণ করেন। তখন কোনো সাহায্য অবতীর্ণ হয়নি। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে অল্প কিছু সাহাবী যারা সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির দ্বারা প্রতারিত হন নি —তারা ব্যতীত বাহিনীর অন্য সবার মাঝে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তখন মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য পায়নি।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿التوبة: ٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿التوبة: ٢٦﴾

‘আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সেদিন সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের প্রতি এবং

অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল'।[২২০]

সাহায্য ও বিজয় দানের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার এই সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এই বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বাতিলের সংখ্যাধিক্য, তাদের বিরাট বিরাট বহর দেখে প্রতারিত হওয়া উচিত না। নিশ্চিত থাকা উচিত, সাহায্য ও বিজয় জড়িয়ে আছে ধৈর্য ধারণের সঙ্গে। কখনোই একটি প্রতিকূল অবস্থা দু'টি স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থাকে পরাভূত করতে পারে না। কারণ সংখ্যাধিক্য—ইমাম রাযী যেমনটা বলেছেন—কখনোই মূল বিষয় নয়, বরং মূল বিষয় হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী সাহায্য। যদি ক্ষমতা হস্তগত হয়েই যায়[২২১], তবে শুরুর দিকে সংখ্যা স্বল্পতা ও লাঞ্ছনায় কি আসে যায়! আর যদি পরাজিতই হতে হয়, তবে সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি দিয়ে কী লাভ!

---

[২২০] সূরা আত-তাওবাহ; ০৯:২৫-২৬
[২২১] অর্থাৎ বিজয় লাভ হয়

বিজয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মর্ম

তাওহীদের পথের পথিকদের একটি বিষয় খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। আর তা হচ্ছে বিজয়ের মর্ম।

নিঃসন্দেহে বিজয়ের সেই মূল মর্মটি হচ্ছে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, যার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন, যে উদ্দেশ্যের জন্য রক্ত ঝরানো, লাশের স্তূপ তৈরি, মতবাদ ও আদর্শ জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে সে লক্ষ্যের বাস্তবায়ন।[২২২]

আকীদাহ ও আদর্শকে জয় করার এই লক্ষ্যের ওপরই প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরাম মানব সমাজের ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ-কে বাইয়াত দিয়েছিলেন এবং মোবারক ওই কাফেলা আল্লাহর পথে মৃত্যুমুখে হেঁটেছিল। পার্থিব ও বৈষয়িক কোনো বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। তাঁদের আশা ও চিন্তার বিষয় শুধু এটাই ছিল যে, কীভাবে এই আকীদাকে জয় করা যায়? কীভাবে এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অনুসারীদের মনে কীভাবে আদর্শের রাজ কায়েম করা যায়? এর বাইরে রাজ্য দখলের কোনো লালসা তাঁদের ছিল না। কোনো সিংহাসন অথবা রাজদণ্ড করায়ত্ত করার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত লাভ করা।

উস্তাদ আবুল হাসান নদভী এই বাস্তবতাকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

“এমনকি যখন তাঁরা নিজেদের অন্তরকে শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্ত করলেন, তাঁরা যখন দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করলেন, অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্য বুঝে নেয়ার মতোই তাঁরা যখন তাঁদের কাছে থাকা অন্যদের প্রাপ্য নিজেদের থেকে বের করে নিয়ে পৃথক করে ফেললেন, দুনিয়াতেই যখন তাঁরা আখিরাতের মানুষে

---

[২২২] বিজয় মানে শুধু রাজ্য জয়, গনীমত লাভ, শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি নয়। বরং বিজয়ের অর্থ আরও গভীর। একজন মুসলিম শত্রুর হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও বিজয় লাভ করবেন যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই ইসলামের ব্যাপারে শত্রুর সাথে বিন্দুমাত্র আপস না করাটাই হল বিজয়ের প্রকৃত মর্ম। - সম্পাদক

পরিণত হলেন, বর্তমানের কোলেই যখন তাঁরা ভবিষ্যতের মহামানব হয়ে গেলেন, বিপদ-আপদ যখন তাঁদেরকে বিমর্ষ করে ফেলত না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যখন তাঁদেরকে উল্লসিত করত না, দারিদ্র যখন তাঁদেরকে অস্থির করে তুলত না, আবার আর্থিক স্বচ্ছলতা যখন তাঁদেরকে সীমালংঘনে প্ররোচিত করত না, ব্যবসা-বাণিজ্য যখন তাঁদেরকে উদাসীনতায় লিপ্ত করত না, শক্তির প্রাবল্য যখন তাঁদেরকে নিরুদ্যম করত না, জমিনে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন তাঁরা লালায়িত ছিলেন না, অনর্থ সৃষ্টি করতে উদ্যত ছিলেন না, মানব সমাজের জন্য যখন তাঁরা ন্যায়-নিষ্ঠার মানদণ্ড হয়ে গেলেন, নিজেদের পিতা-মাতার কিংবা আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে যখন তাঁরা আল্লাহর সাক্ষী হয়ে গেলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় যখন তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করলেন। তাঁরা নির্যাতিত মানবতাকে মুক্ত করলেন। বিশ্বকে রক্ষা করলেন। আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করলেন।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবুল কারীমে সে লোকদের কিছু ঘটনা আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন, যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অতি হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে অপরূপ উপস্থাপনায় আসহাবুল উদখুদের ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন যে, সেখানে মু'মিনদের আকীদাহ কীভাবে বিজয়ী হয়ে গৌরব,সম্মান ও অমরত্ব অর্জন করেছিল। তাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন এমনকি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়ে তাওহীদকে সিঞ্চিত করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল দয়াময় আল্লাহর নেয়ামতের ভাণ্ডার ঘিরে। আরহামুর রাহিমীন আল্লাহর দরবারে তাঁরা সম্মানিত মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এর জন্য তাঁদেরকে বৈষয়িক স্বার্থ তুচ্ছ করতে হয়েছিল। সীমালঙ্ঘনকারী জাহেলি শক্তির অগ্নিগর্ভ গর্তে নিজেদেরকে নিক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। এভাবেই মূল্যহীন জাগতিক স্বার্থের ওপর তাঁরা আকীদাকে স্থান দিয়েছিলেন। দেহবাদী জড় জগতে নয়, বরং আত্মার জগতে তাঁরা বিজয়ের মুকুট লাভ করেছিলেন। প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তাঁরা যুগ যুগান্তরে সকল আদর্শবান ব্যক্তির জন্য পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿البروج: ١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿البروج: ٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿البروج: ٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿البروج: ٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿البروج:

٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿البروج: ٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
﴿البروج: ٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿البروج: ٨﴾
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿البروج: ٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ﴿البروج: ١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿البروج: ١١﴾

"শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, এবং (শপথ) সে দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে, শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) এবং যা কিছু (তখন) পরিদৃষ্ট হয়েছে তার; গর্তের মালিকদের ওপর অভিসম্পাত, আগুনের কুন্ডলী – যা জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, (অভিসম্পাত) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা সমূহ। এটাই মহাসাফল্য"।[২২৩]

পবিত্র আত্মাগুলো রবের কাছে চলে গিয়েছিল। আকীদাহ ও আদর্শের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁরা এ দুনিয়া ছেড়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বহু নেয়ামতের একক মালিকানা তাঁদেরকে দান করেছেন।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ উক্ত আয়াতগুলোর অত্যন্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি 'মা'আলিম ফিত্তারিক্ব - (ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা)' নামক অমর গ্রন্থে অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত মু'মিনদের শুভ পরিণাম সম্পর্কে বলেন,

---

[২২৩] সূরা বুরুজ; ৮৫: ১—১১

“আল্লাহর মানদণ্ডে একমাত্র ঈমানের ওজনই ভারী। আল্লাহর বাজারে শুধু ঈমানের পণ্যেরই চাহিদা রয়েছে। বিজয়ের উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে বস্তুর ওপর ঈমানের প্রাধান্য। উল্লেখিত ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈমানদারদের রূহ, ভয়-ভীতি, দুঃখ কষ্ট এবং পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগলিপ্সার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হয়। চরম নির্যাতনের মুখে ঈমানদারগণ যে বিজয় ও সম্ভ্রম অর্জন করে গিয়েছেন, তা মানব জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। আর এ বিজয়ই হচ্ছে সত্যিকারের বিজয়। সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মৃত্যুর উপলক্ষ হয় বিভিন্ন ধরনের। উল্লেখিত ঈমানদার ব্যক্তিদের মতো সাফল্য সকলের ভাগ্যে জোটে না। এমন উচ্চ পর্যায়ের ঈমান অর্জন করাও অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এ ধরণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সকলে ভোগ করতে পারে না এবং তাদের মতো উচ্চস্তরে বিচরণ করার সৌভাগ্যও সকলের হয় না। আল্লাহ তা'আলাই তার অপার অনুগ্রহে একদল লোককে বাছাই করে নেন, যারা সকল মানুষের মত মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু তাদের উপলক্ষ হয় অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। এ সৌভাগ্য অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। তারা মহান ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করে থাকেন। সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখিত নিরিখে তারা মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী হয়ে যান।...উল্লেখিত মু'মিনদের ঈমান পরিত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এরূপ করার ফলে তারা নিজেরা এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠী কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতো? ‘ঈমান বিহীন জীবনের এক কানাকড়ি মূল্যও নেই’—এ মহান সত্যকে যদি জীবন রক্ষার খাতিরে বর্জন করে দেয়া হতো, তাহলে মানবজাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা হারানোর পর মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। যালিম শাসকগোষ্ঠী যদি দেহের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আত্মার ওপরও শাসন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানবসত্তা চরমভাবে অধঃপতিত হয়। উল্লেখিত ঈমানদারগণ ঈমানের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার ফলে তাদের জীবন্ত দেহে আগুনের দাহিকা শক্তি কার্যকর হবার সময়ও তারা মহাসত্য ও পবিত্রতার ওপর অটল ছিলেন। তাদের নশ্বর দেহ যে সময় আগুনে জ্বলছিল, সে সময় তাদের মহান ও সুউচ্চ আদর্শ সফলতার সোপান বেয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করছিল। বরং আগুন তাদের আদর্শ পরায়ণতাকে আরও ঔজ্জ্বল্য দান করেছিল।”

সত্যের অনুসারীদের স্মৃতিপটে যেন এই চিত্র পাকাপাকিভাবে বসে যায়, প্রতিটি তাওহীদবাদী ব্যক্তি এ বিষয়টি যেন ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, প্রকৃত বিজয় হচ্ছে, আকীদাহ বিজয়ী হওয়া এবং মতবাদ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করা। আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে উল্লেখিত নিরিখে বিজয়ী একজন আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরব। তিনি হলেন ভবিষ্যতের বহু প্রজন্মের মহান শিক্ষক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রাহিমাহুল্লাহ। যখন বহু রথী-মহারথী পাপিষ্ঠ, নির্লজ্জ তাগুত গোষ্ঠীর পায়ের সামনে নত ছিল, তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য তাদের ভিক্ষার হাত পাতা ছিল, অন্যদের দুনিয়ার বিনিময়ে যখন তারা নিজেদের দ্বীনকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করছিল, তখন আপোষহীন সাইয়্যেদ কুতুব আদর্শের ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন। দীপ্ত কণ্ঠে নিজ আকীদাহ ও দ্বীনের ঘোষণা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন। দুনিয়ার যাবতীয় স্বার্থ তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। দুনিয়া যখন লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল, তুচ্ছ হয়ে যখন তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল, তখন তিনি সেগুলো পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিলেন। কোনো দিকে না ভ্রুক্ষেপ না করে আপন রবের বাণী প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। নবী-রাসূলদের আমানত রক্ষায় তিনি জালিমের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করেননি। কোনো ধরনের হুমকি-ধামকিতে তিনি ভয় পাননি। কারাগারে নির্যাতনের ভয় তাঁকে অস্থির করে তুলতে পারেনি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি আদর্শের জয়গান গেয়ে গেছেন। তাগুত আব্দুল নাসেরের বিরুদ্ধে যে আঙ্গুল দিয়ে তিনি সত্যের বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাগুতের সমর্থনে কিংবা তাগুতের প্রতি সম্প্রীতি প্রদর্শনে তিনি সে আঙ্গুল ব্যবহৃত হতে দেননি। এই অবস্থায়ই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

আকীদাকে জয়ী করার জন্য, আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য সাইয়্যেদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর কথাগুলো আজ জীবন্ত হয়ে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মজবুত দলীল হয়ে আমাদের জন্য আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। রাসূলদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদেরকে সাহায্য করার পক্ষে তাঁর দুর্যোগ কবলিত জীবনের ঘটনাগুলো বিশ্ববাসীর জন্য হয়ে আছে উত্তম দৃষ্টান্ত, আলোর মিনার ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণপঞ্জি। তাঁর জীবনী আজও বিশ্ববাসীর মনে সৃষ্টি করছে রাসূলের অনুসারীদের জন্য প্রশংসার আসন।

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের মতো দ্বীনের অনান্য ধারক-বাহকদের কীর্তিগুলো আজও অমর হয়ে আছে যদিও তাঁদের দেহ ও বাহ্যিক আকৃতি এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এবং তাঁরা সাহায্য ও বিজয় দেখে যেতে পারেননি।

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿غافر: ٥١﴾
يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿غافر: ٥٢﴾

'নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।সে দিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোনো উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ। এবং তাদের জন্যে আরও থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস'।[২২৪]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****

[২২৪] সূরা মু'মিন; ৪০: ৫১-৫২